পাবনা জেলার আন্দোলনে-সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ

পাবনার মানুষ চিরকালই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। অত্যাচারী নীলকর, রক্তচোষা জমিদার, ব্রিটিশ বেনিয়া, হিংস্র পাকসেনা–কেউই টিকতে পারেনি এই মাটিতে। কৈবর্তবিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, প্রজাবিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ, স্বদেশি আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, সলঙ্গা বিদ্রোহ, পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ভুট্টা আন্দোলন এবং স্বাধিকার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে এ-অঞ্চলের মানুষের রয়েছে বীরত্বপূর্ণ অবদান।

কৈবর্তবিদ্রোহ

পাবনা জেলার চলনবিলের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে কৈবর্তবিদ্রোহের ঢেউ লেগেছিল। পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে ১০৫৫-১০৫৬ খ্রিস্টাব্দে কৈবর্ত নেতা দিব্যক ও তার ভাতুষ্পুত্র ভীমের নেতৃত্বে বরেন্দ্র অঞ্চলের কৈবর্তরা বিদ্রোহ করেছিল। এ-বিদ্রোহে রাজা দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত হয় এবং কৈবর্ত নেতা দিব্যক বরেন্দ্র অঞ্চল দখল করেন। তাঁর ভাতুষ্পুত্র ভীম গৌড় ও বরেন্দ্রীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ভীম চলনবিলের উত্তর সীমান্তে তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়ার শেরপুর পর্যন্ত মাটির প্রাচীর বা 'সুবিস্তৃত জাঙ্গাল' নির্মাণ করেন, যা এখনো 'ভীমের জাঙ্গাল' নামে পরিচিত। সন্ধাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থেও ভীমের প্রসঙ্গ আছে।

সিপাহী-বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয় সিপাহী বিদ্রোহ। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মতো সিপাহী বিদ্রোহের উত্তাপ পাবনার মাটিতে এসে পড়েছিল। ঢাকার বিদ্রোহী দলের উত্তর দিকে যাত্রাকালে সিরাজগঞ্জ বন্দর লুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. টি ই রেভেন্স পাবনার নীলকর ও অন্যান্য ইউরোপীয়দেরকে ডেকে একদল অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করে সিরাজগঞ্জের দিকে অগ্রসর হন। এতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য সাহায্যকারীগণ গভর্নমেন্টের ধন্যবাদ লাভ করেন। এছাড়া পাবনায় বসবাসকারী ইউরোপীয় নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে ১৮৫৭ সালের ২৬ মার্চ রেভেন্স সাহেব এক পত্র জারি করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁতিবন্দের জমিদার বিজয়গোবিন্দ ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন। ইংরেজ সরকার খুশি হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। জানা যায়, তাঁতিবন্দের জমিদার বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী ঢাকা থেকে পাবনা পর্যন্ত সিপাহীদের গতিরোধ করার জন্য নিজ ব্যয়ে রক্ষক নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে দুলাইয়ের জমিদার আজিম চৌধুরী সিপাহীদের পক্ষে অবস্থান নেন। এ-জেলার আটঘরিয়ায় সিপাহীদের ধরে এনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

নীলবিদ্রোহ

পাবনা জেলায় এক সময় ৫টি প্রধান কুঠি বা কন্‌সার্ন-এর অধীনে বিভিন্ন গ্রামে নীলচাষ হতো। নীলকররা কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রিম দাদন দিতো, তা যথাযথভাবে পরিশোধ করতে না পারলে কৃষকদের ওপর নির্যাতন চালাতো। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে নীলবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ-বিদ্রোহ পাবনা জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার কৃষকরা সংগঠিত হয়ে নীলচাষে অস্বীকার করে এবং নীলবিদ্রোহে অংশ নেয়। পাবনার কৃষকেরা নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাঁদের দমন করার জন্য দ্বিতীয় বেঙ্গল পুলিশ ব্যাটালিয়ানের হাবিলদার সেভো খানকে পাবনায় পাঠানো হয়। ১৮৬০ সালে লেখা তাঁর এক চিঠিতে পাবনা জেলার নীল বিদ্রোহীদের সাথে তাঁর দলের এক খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রজাবিদ্রোহ বা পলোবিদ্রোহ

ব্রিটিশ ভারতের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে পাবনার প্রজাবিদ্রোহ এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এ-বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৮৭২-৭৩ সালে। শাহজাদপুরে শুরু হওয়া এই আন্দোলন সারা পাবনা জেলা এমনকি জেলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলেই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' চালু হয়, যা 'প্রজাদের সনদ' নামে পরিচিত। নানা অজুহাত জামিদার ও তাদের কর্মচারীরা প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতো। কখনও ইচ্ছায়, কখনও অনিচ্ছায় প্রজারা এগুলো দিতে বাধ্য হতো। এতে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ জন্মে। এমতাবস্থায় কয়েকজন জমিদার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনে নাটোরের

জমিদারদের ইউসুফশাহী পরগনা নিলামে ক্রয় করে। জমিদারি ক্রয়ের পর নতুন জমিদাররা খাজনা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালায়, এতে প্রজাদের ক্ষোভ আরও বাড়ে। এমন পরিস্থিতিতে শাহজাদপুরের প্রজারা খাজনা আদায়ে বাধা দেয় এবং নিজেদের বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে। ১৮৭২ সালের মে মাসে প্রজারা সংগঠিত হয় এবং জুন মাসে তারা পুরো পরগনায় ছড়িয়ে পড়ে। শাহজাদপুর থানার দৌলতপুরের ঈশানচন্দ্র রায় বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়ে তাঁদের নেতা হন।

পাবনা জেলার এই বিদ্রোহ 'পলোবিদ্রোহ' নামেও পরিচিত। প্রজারা মাছ ধরার ভান করে কাঁধে একটি লাঠি এবং লাঠির মাথায় পলো বেঁধে মহিষের শিং বাজিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে চলতো। এঁরা 'পালোওয়াল বা পলোওয়ালা বা পলোনাথ কোম্পানি' নামে পরিচিত ছিল। লোককবির বর্ণনা : 'লাঠি হাতে পলো কাঁধে চলল সারি সারি/সকলের আগে যায়ে লুটলো বিশির কাচারি।' প্রজাবিদ্রোহের ফলে যখন প্রবল অরাজকতা সৃষ্টি হয়, তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ভি. টেলর পুলিশ নিয়ে সিরাজগঞ্জ উপস্থিত হন এবং বিভিন্ন স্থানে টহল দিতে থাকেন। যেসব এলাকায় বেশি অরাজকতা চলে সেসব স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ, এমনকি সামরিক পুলিশ নিযুক্ত করা হয়। বহু স্থানে স্পেশাল পুলিশ নিযুক্ত করা হয় এবং ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে গোয়ালন্দ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠানো হয়। বাংলার ছোটলাটের আদেশে সামরিক পুলিশ বাহিনীও পাঠানো হয়। প্রজাবিদ্রোহের নেতা ঈশানচন্দ্র রায় এবং অন্যান্য দলনেতা গ্রেফতার হলেন। ঈশানচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হলেও ৩০২ জন আসামীর মধ্যে ১৪৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। এরপর প্রজারা ধীরে ধীরে শান্ত হয়। সরকার ১৮৮৫ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' প্রবর্তন করে জমির ওপর প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বঙ্গদেশে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ-বিদ্রোহ শুরু হয় ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে এবং স্থায়ী হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। পাবনাতেও এর ঢেউ লাগে। পাবনা জেলার কোন্ স্থানে সন্ন্যাসীরা আস্তানা গেড়েছিল তা সুনিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবে বেড়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এদের প্রভাব ছিল বলে জানা যায়। বেড়ার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামে সন্ন্যাসীদের বসবাসের নিদর্শন রয়েছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের স্মৃতি বহন করছে বেড়া উপজেলার সন্ন্যাসীবাধা, শ্রীনিবাসদিয়া, সিংহাসন, সাফলা, শিবপুর প্রভৃতি গ্রাম।

সলঙ্গা-বিদ্রোহ

পাবনা জেলার আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে সলঙ্গা বিদ্রোহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯২২ সালের ১৮ জানুয়ারি শুক্রবার মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল সলঙ্গার মাটিতে। আন্দোলন ঠেকাতে পাবনার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. আর. এন. দাস ও তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক মি. এন. কে. সিনহার নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়েছিল। গ্রেফতার করা হয় মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশকে। এতে বিদ্রোহের আগুন আরও দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজের পদলেহী বাহিনীর ওপর। সলঙ্গা বিদ্রোহে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন অনেক মানুষ। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা জনতার আক্রোশের মুখে মওলানা তর্কবাগীশকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সলঙ্গা-বিদ্রোহে আত্মদানকারীদের লাশ রহমতগঞ্জ গণকবরে সমাহিত করা হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাবনাবাসীর এ বিদ্রোহ ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়।

স্বদেশি আন্দোলন

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে স্বদেশি আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এ-আন্দোলনের একটি কৌশল ছিল বিলেতি দ্রব্য বর্জন ও দেশীয় পণ্যের ব্যবহার করে ইংরেজদের চাপে রাখা। পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে স্বদেশি আন্দোলনের হাওয়া লাগে। স্থানে স্থানে সংঘাত-সংঘর্ষও হয়। স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাল পরিবেশে ১৯০৮ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্স। এতে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই কনফারেন্সে স্বদেশি আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। ১৯১৩ সালে স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিরাজগঞ্জে আসেন। তখন হিন্দু-মুসলমান পক্ষ-বিপক্ষের বোধটি বড় হয়ে দেখা দেয়। বাঙালি লেখক ও কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রতিপক্ষের হাতে প্রহৃত হন। শুধু তাই নয়, স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং 'অনলপ্রবাহ' গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে দু-বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। স্বদেশি আন্দোলন পাবনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সাঁথিয়ার

সোনাতলা গ্রামের হরিদাস চক্রবর্তী স্বদেশি আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। তিনি স্থানীয় জনসাধারণকে স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করেন। উল্লাপাড়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেক মানুষ স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

তুরস্কের খেলাফত রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে যে-আন্দোলন হয় পাবনা জেলায় তার প্রবল প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, এম এ গফুর, এম সেরাজুল হক, আসাদল্লাহ সিরাজী, দেওয়ান লুৎফর রহমান প্রমুখ নেতা পাবনায় খেলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তুরস্ক সরকারকে সাহায্য করার জন্য 'এ্যাঙ্গরা ফান্ড' গঠন করা হয়েছিল। পাবনার খেলাফত আন্দোলনকারী নেতারা ভারতের খেলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর কাছে দশ হাজার যুবকের সমন্বয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের মতো অসহযোগ আন্দোলনেও পাবনার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে নতুন সংশোধিত ব্যবস্থাপক আইন প্রবর্তনের ফলে এদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এ-জেলার জনসাধারণ খদ্দর ব্যবহার, চরকায় সুতা কাটা, স্বদেশি দ্রব্য প্রচার, এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার বন্ধসহ নানাভাবে অসহযোগ আন্দোলনকে জোরদার করে। সাঁথিয়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, ভাঙ্গুড়া, বেড়া, সুজানগর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে স্বেচ্ছাসেবক দল পিকেটিং ও বক্তৃতা করে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলে।

পাকিস্তান আন্দোলন

পাকিস্তান আন্দোলনে পাবনার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পৃক্ত হয়। এ-আন্দোলনের ভিত্তিভূমি ছিল ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ মহকুমার চরবেলতৈল গ্রামের নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। সে-সময় আফজাল খাঁ মোক্তার, খান সাহেব ওসমান গণি মোক্তার, ইজ্জত উল্লাহ পেশকার সিরাজগঞ্জে মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। তাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখেন। পাবনা শহরে এ এম এ হামিদ, ডা. তোফাজ্জল হোসেন, ডা. মোফাজ্জল হোসেন, দেওয়ান লুৎফর রহমান মুসলিম লীগকে সুসংগঠিত করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার করেন। এছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনকে বেগবান করতে ও মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন আবদুল মজিদ উকিল, রজব আলী উকিল, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ উকিল, সৈয়দ আকবর আলী উকিল, আব্দুর রশিদ মাহমুদ উকিল, কাজী মতিয়ার রহমান, আবুল কাশেম মোক্তার, গোলাম আজম মোক্তার, সেকেন্দার আলী মোক্তার, তোরাব আলী উকিল, বজলুর রহমান আলমাজী প্রমুখ ব্যক্তি।

১৯৩৭ সালে সিরাজগঞ্জে জনসভায় এসেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। জনস্রোত দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালের ২২ ও ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। লাহোর প্রস্তাবের পর পাবনার মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হয়েছে 'লড়কে লেংগে পাকিস্তান'। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পূর্বে নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হলে সিরাজগঞ্জের আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাবনার মানুষ মুসলিম লীগকে জয়যুক্ত করে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা বিষয়ক সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ হওয়ার সংবাদ পাবনা পৌঁছালে এখানকার ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক দলের নেতারা 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে'র জন্য সংগঠিত হন। তাৎক্ষণিক সভা করে এ এল এম মাহবুবুর রহমান খান এবং আমিনুল ইসলাম বাদশাহকে যুগ্ম-আহবায়ক করে গঠন করা হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এরপর পাবনার ছাত্রজনতা স্বতঃফূর্তভাবে রাজপথে নেমে আসে। ১৯৫২ সালে পাবনা জেলায় ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়। এ সময় পাবনায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র আহ্বায়ক ছিলেন আব্দুল মমিন তালুকদার। কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক হন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক। এই কমিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন–ফজলুল আজিম, আনসার আলী, ফজলে কবির, আব্দুল আজিজ, শওকত আলী, মাহমুদ আলম খান, মো. আলাউদ্দিন, হাসান আলী মোল্লা, শামসুজ্জোহা, জয়নাল আবেদীন খান প্রমুখ। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠনে ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, আমজাদ হোসেন, আবদুর রব বগা মিয়ার অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। এছাড়া পাবনার

প্রগতিশীল সংগঠন 'শিখা সংঘে'র সদস্য আবদুল মতিন, রণেশ মৈত্র, জয়নাল আবেদীন খান, আনোয়ারুল হক, মোজাম্মেল হক, কামাল লোহানী প্রমুখ তরুণ ভাষা আন্দোলনে অনন্য অবদান রাখেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন এবং হরতাল-মিছিল ও বিক্ষোভ-সমাবেশ করা হয়। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, রওশনজান চৌধুরী, মাহবুবুল হক ফেরু দেওয়ান, আবদুর রব বগা মিয়া, আমজাদ হোসেনসহ অনেকে মিছিলে যোগ দেন।

১৯৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় ছাপা হয় : "পাবনা ২২ ফেব্রুয়ারী। গতকল্য পূর্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় পাবনায় প্রায় তিন হাজার ছাত্র ধর্মঘট করিয়া 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'ছাত্র বন্দীদের মুক্তি চাই' প্রভৃতি ধ্বনিসহ সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করেন। অপরাহ্নে কলেজ প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় মির্জ্জা শওকত হোসেন সভাপতিত্ব করেন। সভায় বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণের এবং আরবী হরফে বাংলা ভাষা প্রচলনের অদ্ভুত প্রস্তাব প্রত্যাহারের এবং অবিলম্বে ছাত্রদের মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

২২ ফেব্রুয়ারি পাবনা শহরে সর্বাত্মক হরতাল এবং প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তেইশ তারিখেও পাবনা শহরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। প্রতিবাদ মিছিল ও শোভাযাত্রা শেষে বিকেলে পাবনা টাউন হলে বিশাল সমাবেশ হয়। পাবনার ভাষা আন্দোলনে প্রতিক্রিয়াশীল-চক্র নানাভাবে বাধা দিয়েছে। অপপ্রচার চালানোর পাশাপাশি সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে তারা ভাষা আন্দোলনকারীদের দমনের চেষ্টা চালিয়েছে।

৫৩-র নুরুল আমীন-বিরোধী আন্দোলন

১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম লীগের সম্মেলন উপলক্ষে নুরুল আমীনসহ অন্য নেতাদের পাবনায় আগমনকে কেন্দ্র করে ছাত্রজনতা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। মুসলিম লীগ নেতা নুরুল আমিন, আবদুল কাইউম, সরদার আবদুর রব নিস্তার পাবনা সার্কিট হাউসে পৌঁছালে ছাত্ররা বিরাট মিছিল নিয়ে সেখানে পৌঁছে। এ-সময় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মিছিলকারীদের শান্ত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। ছাত্ররা মিছিল নিয়ে সার্কিট হাউসের পাশ দিয়ে ঘুরে টাউন হলে এসে জমায়েত হয় এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে। পরে হাজার হাজার ছাত্র বাধা উপেক্ষা করে মিছিল নিয়ে প্রবেশ করে নূরুল আমিনের সম্মেলনস্থলে। এ-সময় সম্মেলনের লোকজন এবং নূরুল আমিন ও মুসলিম লীগ নেতারা পালিয়ে যায়। মিছিলে হামলার প্রতিবাদে পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি শহরে হরতাল পালিত হয়। অগণিত নেতা-কর্মীকে মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়।

৬২-র শিক্ষা কমিশন আন্দোলন ও সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পাবনা জেলায় যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের নিরঙ্কুশ বিজয় জানান দেয় মুসলিম লীগের প্রতি পাবনার মানুষের বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কথা। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে পিষ্ট হয়ে এখানকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর প্রকাশ ঘটে ৬২-র শিক্ষা কমিশন-বিরোধী আন্দোলনে। এরই মধ্যে ১৯৬২ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য এবং আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ার লক্ষ্যে পাবনা স্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসভা করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ গণতন্ত্রকামী নেতা। ইত্তেফাক পত্রিকা থেকে জানা যায় : 'শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন : সামরিক শাসনামলে দুনিয়ায় যে নজির নাই তাহাও সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাকরুদ্ধ মানুষকে বেত মারার নজীর ইতিহাসে আছে বলিয়া দেখা যায় না।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৬২) স্বৈরাচার আইয়ুব খান যতই দেশে দুঃশাসন কায়েম করেছে ততই জনগণ সংগঠিত হয়েছে স্বাধিকার সংগ্রামে। এই সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনে পাবনার জনগণকে সংগঠিত করতে বারবার ছুটে এসছেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৪ সালের ৯ মে পাবনায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। ইত্তেফাক থেকে জানা যায় : 'পাবনা, ৯ই মে–অদ্য এখানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করিয়া এবং জনগণের দাবীকে অস্বীকার করিয়া পৃথিবীর কোনো শাসক কোনো দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। এবং পাকিস্থানেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। তিনি বলেন, সেদিন সুদূর নয়, যখন ... জনগণের রুদ্ররোষে ক্ষমতাসীনদের হাওয়াই-প্রাসাদ ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে। তিনি ঘোষণা করেন, জনগণ আজ নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ মে ১৯৬৪)

৬৬-র ৬-দফা আন্দোলন

৬৬-র ৬-দফা আন্দোলনে পাবনা জেলায় ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ এপ্রিল পাবনা টাউন হল মাঠে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় সে সম্পর্কে বলা হয় : 'পাবনা, ৮ এপ্রিল–পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন : প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যদি পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরে রাজি হন, তবে তিনি ও তাহার দল ছয় দফা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত। ছয়দফার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য শেখ সাহেব সরকার পক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, উক্ত গণভোটে ৬-দফা বিরোধীরা শতকরা ৩০ ভাগ ভোট পাইলে বাকী জীবনের জন্য রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। স্থানীয় টাউন হল ময়দানে সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ছয়-দফা কর্মসূচী শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান নহে, পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর জন্যও ম্যাগনাকার্টা এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিবার ইহাই সুনিশ্চিত পন্থা বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এই জনসভায় শ্রোতাবর্গের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে রীতিমত আশাতীত বলা চলে। পাবনায় যে এত বিরাট জনসভা হইবে সভার উদ্যোক্তারাও তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান একে একে তাঁহার দলের ছয়-দফার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে থাকিলে মুহুর্মুহু জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে জনতা তৎপ্রতি অভিনন্দন জানায় এবং সর্বশেষে হাত তুলিয়া ছয়-দফা অর্জনে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া যাওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করে। তুমুল করতালির মধ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি জনগণকে হয় মানুষের মত বাঁচার, না হয় মানুষের মত মরার আহ্বান জানান। তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবহেলিত অবস্থা যদি আরও ১০ বৎসর অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে এখানকার মানুষের আর কাপড় পরারও সঙ্গতি থাকিবে না। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা হিন্দুদের সামনে জুতা পরিতে পারিত না বলিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যে মন্তব্য করিয়াছেন, শেখ মুজিব তাহাকে পরিতাপজনক বলিয়া অভিহিত করেন। শেখ সাহেব বলেন যে, এই মন্তব্য দ্বারা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের অপমান করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতির পক্ষে অনুরূপ মন্তব্য 'অশোভন' বলিয়া শেখ মুজিবুর রহমান অভিমত প্রকাশ করেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক ইস্যুসমূহের বিচার-বিবেচনার সময় যুক্তিবাদী মনোভাব গ্রহণের অনুরোধ করেন।'

এ সময়ই পাবনার আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতারা স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ তাঁর 'যমুনার জল ছুঁয়ে যাওয়া এই জনপদ : মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক লেখায় বলেছেন : '১৯৬৬ সনের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা ও প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম রাকসু-র ভিপি আবু সাইয়িদসহ (আমি) ছাত্রনেতাদের সঙ্গে পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আমজাদ হোসেন সাহেবের বাসভবনে বৈঠক করেন। আলোচনায় অভিমত বেরিয়ে আসে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তারাও একমত। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন বলতে বুঝতেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় বাঙালি নেতৃত্বের ক্ষমতাসীন হওয়া। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল শুধু ক্ষমতায় যাওয়া নয়, ছয় দফার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধীনতার প্রশ্ন। এই সময় পাবনার ছাত্রনেতা আবদুস সাত্তার লালু, রফিকুল ইসলাম বকুল, ছাত্রনেতা সাহাবউদ্দিন চুপ্পু, আফজাল হোসেন খোকা, সোহরাব উদ্দিন সোবা, আজিজুল হক, বেবী ইসলাম এবং যুবনেতাদের ভেতরে আহমেদ রফিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেদিন পাবনার ছাত্রলীগ নেতারা পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ নেতাদের পাবনার মাটিতে ঠাঁই দেননি। এমনিভাবে ছাত্ররা সেদিন স্ব-স্ব জেলা-থানায় গিয়ে ৬-দফার পক্ষে অবস্থান নেন এবং ৬-দফা প্রচার করেন। এমনকি পাবনার ঈশ্বরদীর মহিউদ্দিন আহমেদ, নওয়াব আলী, নুরু ভাই প্রমুখের অনুরোধে প্রায় প্রতি মাসেই ঈশ্বরদীর রেলস্টেশনের ওভারব্রিজের পাশে মটরস্টেশনে জনসভা করা হতো। সে-সময় জাফর সাজ্জাদ আমাকে প্রধান অতিথি করে পাকশীতে বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। স্থানীয় নেতারাও এখানে বক্তব্য রাখেন।'

১৯৬৭ সালের ভুট্টা আন্দোলন

পাবনা জেলার আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে ষাটের দশকের সবচেয়ে আলোড়িত ঘটনা ৬৭-র ভুট্টা আন্দোলন। এ-আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নিয়েছিল ১৯৬৭ সালের ১৬ মার্চ, বৃহস্পতিবারে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইউব খান পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র মানুষ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের জন্য সাহায্য হিসেবে ভুট্টা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই

ভুট্টার রুটি খেয়ে পাবনায় অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করে। 'দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে ১৫ মার্চ, ১৯৬৭ তারিখে। এদিন পাবনা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে খাদ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ নিয়ে একাধিক রোগী ভর্তি হন এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা সাধ্যমত চিকিৎসা সেবা দিতে থাকেন। রোগীর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই মধ্যে শহরের রামচন্দ্রপুরের রিক্সাচালক হারু মিয়া ও তার স্ত্রী দুর্ভাগ্যজনকভাবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।' 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় ছাপা হয় : 'পাবনা, ১৬ই মার্চ। ভুট্টার রুটি ভক্ষণ করিয়া এ পর্যন্ত ২ ব্যক্তি হারু শেখ ও তার স্ত্রী মারা গিয়াছে এবং ১৭০ জন অজ্ঞান হইয়া হাসপাতালে শয্যাশায়ী রহিয়াছে। আজ সকাল ১১ ঘটিকায় প্রায় ১৫ সহস্রাধিক ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা খাদ্য ও কৃষি দফতরের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন জায়েদীর বাড়ীর সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং কয়েকটি স্থানে অগ্নি সংযোগ করে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। ফলে প্রায় ১০/১২ জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হয়। ৪/৫ বৎসরের একটি বাচ্চা মেয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। কয়েকজনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে। কাহাকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই। শোনা যায়, বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণও নাকি ইট-পাটকেল ছোড়ে ও বন্দুক ব্যবহার করে। একটি বন্দুকের দোকানও নাকি লুঠ হইয়াছে। প্রকাশ, বিক্ষুব্ধ জনতা ইপিআরটিসি'র একটি বাসের জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলে। বর্তমানে শহরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হইয়াছে। শহরে আজ ধর্মঘট হয় এবং স্কুল, কলেজ ও দোকানপাট বন্ধ থাকে।'

এ-ঘটনায় পাবনা থানায় মোট ১৩টি মামলা দায়ের করা হয়। গ্রেফতার করা হয় শত শত মানুষকে। মামলায় আসামী করা হয় ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, আমজাদ হোসেন এমএনএ, এ্যাডভোকেট আমজাদ হোসেন, আমিনুল ইসলাম বাদশা, মো. নাসিম, এ্যাডভোকেট আমিনুদ্দিন, মতিয়ুর রহমান বাচ্চু, ফজলুর রহমান পটলসহ অসংখ্য নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষকে। পাবনা-র তৎকালীন 'দৈনিক আজাদ' প্রতিনিধি সাংবাদিক আনোয়ারুল হককে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৭-র এই ভুট্টা আন্দোলন পাবনার মানুষকে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণের শক্তি অর্জনে সহায়তা করে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে।

৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান: পুলিশের গুলিতে শহিদ হন আবদুস সাত্তার

৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে পাবনার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। গণঅভ্যুত্থান যখন তুঙ্গে তখন সুজানগরে একুশের মিছিল ও শোভাযাত্রায় গুলি চালায় পুলিশ। গুলিতে শহিদ হয় সুজানগর স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র, ছাত্রলীগ কর্মী, আতাইকান্দা গ্রামের সন্তান আব্দুস সাত্তার। আব্দুস সাত্তারের শহিদ হওয়ার খবর মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে পাবনার সর্বত্র। ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুরে সুজানগর স্কুলমাঠে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এম. মনসুর আলী, আবদুর রব বগা মিয়া, আমজাদ হোসেন, এডভোকেট আমিন উদ্দিন, ওয়াজিউদ্দিন খান, অধ্যক্ষ আব্দুল গণি, গোলাম হাস্নায়েন, আবু সাইয়িদ, মাহতাব উদ্দিন বিশ্বাস, শামসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম বকুল, আব্দুস সাত্তার লালু, আমিনুল হক টিপু বিশ্বাস, নজমুল হক নান্নু প্রমুখ। শহিদ আব্দুস সাত্তারের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের মিলনায়তনটির নামকরণ করা হয়েছে 'শহিদ আব্দুস সাত্তার মিলনায়তন'।

৭০-এর নির্বাচন

স্বাধিকার আন্দোলনে সফলতার পথ ধরে আসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন। এ নির্বাচনে পাবনা জেলার সব কটি আসনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী। পাবনার ছয়টি আসনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ (এমএনএ) হলেন–পাবনা-১ : মোতাহার হোসেন তালুকদার ; পাবনা-২ : মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ; পাবনা-৩ : আবদুল মোমেন তালুকদার ; পাবনা-৪ : সৈয়দ হোসেন মনসুর ; পাবনা-৫ : অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ; পাবনা-৬ : এ কে এম মাহবুবুল ইসলাম। এখানকার ১২টি আসনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ (এমপিএ) হলেন–পাবনা-১ : মোহাম্মদ মনসুর আলী ; পাবনা-২ : সৈয়দ হায়দার আলী ; পাবনা-৩ : মোঃ রওশানুল হক ; পাবনা-৪ : এ্যাডভোকেট এস এম গোলাম হাস্নায়েন ; পাবনা-৫ : কে বি এম আবু হেনা ; পাবনা-৬ : এ কে এম মাহবুবুল ইসলাম ; পাবনা-৭ : মোঃ আব্দুর রহমান ; পাবনা-৮ : আহমেদ রফিক ; পাবনা-৯ : তফিজ উদ্দিন আহমদ ; পাবনা-১০ : মোজাম্মেল হক সমাজী ; পাবনা-১১ : এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন ; পাবনা-১২ : আবদুর রব বগা মিয়া। এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরও

পাকিস্তন সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তালবাহানা শুরু করে। এরপর শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন, চূড়ান্ত ধাপে তা মুক্তি সংগ্রামে রূপলাভ করে, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে।

প্রতিরোধ যুদ্ধ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর সারা দেশের মতো পাবনার মানুষ ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাবনায় ছাত্র-জনতা গড়ে তোলে দুর্বার গণ-আন্দোলন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে পাবনার ছাত্র ও যুবসমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরি হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা বেবী ইসলাম সাক্ষাৎকারে বলেছেন : '৬-দফা ও ১১-দফা ভিত্তিক আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান-এর পর আমরা বুঝতে পারি যে, একটি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই দেশ স্বাধীন করতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পাবনায় আমরা (ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা-কর্মীরা) সেভাবেই প্রস্তুত হতে থাকি। পাবনা জেলা স্কুলে আমরা শারীরিক নানা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। শুধু তাই নয়, ওখানকার ল্যাবরেটরির বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান থেকে আমরা বোমা ও এসিড বাল্ব তৈরির কৌশল আয়ত্ত্ব করি। এছাড়া দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুরু হয় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি।' পাবনা শহরের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলেও চলতে থাকে প্রতিরোধের প্রস্তুতি। সাঁথিয়া, ঈশ্বরদীসহ প্রায় প্রতিটি থানায় চলে এই প্রস্তুতি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর ছাত্র-জনতা যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় মাঠে নামে। আবুল কালাম আজাদ যথার্থই বলেছেন : 'একাত্তরের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হলো সমগ্র দেশ জুড়ে। ...শেখ মুজিবুর রহমানের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি ঘরে গড়ে উঠলো দুর্গের পর দুর্গ। ...পাবনার জনসাধারণ সেদিন যার ঘরে যে অস্ত্র ছিলো তাই নিয়েই শুরু করেছিলেন যুদ্ধের মহড়া। ...পাবনা জেলার শহর-বন্দর-গ্রামে সেদিন গড়ে উঠেছিল প্রবল প্রতিরোধ। বৃহত্তর পাবনা জেলার ৯টি থানা–পাবনা সদর, সাঁথিয়া, সুজানগর, বেড়া, ফরিদপুর, ঈশ্বরদী, চাটমোহর, আটঘরিয়া ও ভাঙ্গুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শুরু হয়েছিল আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি।'

পাবনার বেড়া থানার নাকালিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ লিখেছেন : 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ দিক নির্দেশনামূলক ভাষণের পর নাকালিয়া বাজারের আব্দুল মান্নানের পিতা মরহুম হাজী খোরশেদ আলী মোল্লার বাজার ঘরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রায় ৪০ (চল্লিশ) জন মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য গোলাম আজম ও ইমান আলী, আব্দুল মান্নান, জীবন দত্ত, হোসেন আলী, মোহাম্মদ আলী ঘড়ি, রেজাউল করিম, গোলজার হোসেন, আব্দুল আউয়াল, হারুন, জয়নাল আবেদীন, আহম্মদ আলী, আফতাব আলী আতাব, ফজলুল হক, ইনসাফ, আব্দুর রউফ, আব্দুল ওহাব, সিরাজুল হক, মহিউদ্দিন কালু, আব্দুল জলিল, আবদুল মতিন, আব্দুল মান্নান (ফেতাং) এদেরকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য বেড়া থেকে পাঠিয়েছিলাম আনছার কমান্ডার ও আফছার আলীকে। ...তারপর স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক এলো, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন। শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ। '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসররা বিশেষভাবে মোফাজ্জল মওলানার নেতৃত্বে নাকালিয়া-হাটুরিয়ার বহু বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। দোকান পাট লুটপাট করে। ২৬ মার্চ ঐতিহ্যবাহী বিশাল রথ, যা হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির নিদর্শন ছিল, পাকিস্তান হানাদার বাহিনী প্রথম এসেই সেই রথ পুড়িয়ে দেয়। একইসাথে বহু মানুষকে ডাঙ্গায় এবং নদীতে হত্যা করে।'

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শোনার পর থেকে পাবনার সাঁথিয়া থানায় সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ছাত্র ও যুবকেরা কাঠের ড্যামি রাইফেল এবং বাঁধের লাঠি নিয়ে ট্রেনিং শুরু করেন। ট্রেনিং দিতে এগিয়ে আসেন সাঁথিয়া গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য কাজী মোসলেম উদ্দিন, শশদিয়া গ্রামের আনসার কমান্ডার আফতাব উদ্দিন, কোনাবাড়িয়া গ্রামের আনসার কমান্ডার মজিবুর রহমান প্রমুখ। সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী কৌশলে যুবকদের রাইফেল ও গুলি দেন। এ সময় ছাত্র ও যুবকদের সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল ওয়াহাব (জিতু দারোগা), সাঁথিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রোস্তম আলী, কাশিনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আয়েজ উদ্দিন প্রমুখ। ট্রেনিং গ্রহণ করেন ফজলুল হক, নিজাম উদ্দিন, আয়েজউদ্দিন, আলতাব হোসেন, লোকমান হোসেন, রেজাউল করিম, আবু হানিফ মল্লিক, নজরুল ইসলাম চাঁদু, গোলাম মোর্শেদ, আব্দুল লতিফ

প্রমুখ। ২৪ মার্চ সাঁথিয়ার বোয়াইলমারী বাজারে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, এলাকার কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ জনতার উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বেড়া থানায় ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করেন তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। ২৫ মার্চ তিনি সাঁথিয়া ও বেড়ার যুবকদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। এ সময় ঈশ্বরদী থানায় আওয়ামী লীগ সভাপতি মহিউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে "ঈশ্বরদী থানা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয়। ১৭ মার্চ সকাল ১০টায় ঈশ্বরদী বাসস্ট্যান্ডে স্মরণ কালের সবচেয়ে বড় ছাত্র গণসমাবেশ হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সকালে পাবনা শহরে রিদ্দিকের বাড়ির সামনের মাঠে এক জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। সভা চলাকালে ডিএসপির পাঠানো এক পুলিশ সদস্য খবর দেয় যে ঢাকায় ক্র্যাকডাউন হয়েছে, যে কোনো সময় পাবনাতেও আর্মি চলে আসবে। এ খবর শুনে ছাত্র-জনতা অস্ত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একে একে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু হলো। এডরুক লিমিটেডের রাজ্জাক তার বাড়ি থেকে একটি রাইফেল ও একটি দোনলা বন্দুক নিয়ে এলো। গোপালপুর থেকে দুটি টুটু বোর রাইফেল সংগ্রহ করা হলো। হায়দার ইঞ্জিনিয়ার তাঁর বন্দুকটি দিয়ে দিলেন। এভাবে সারা দিন শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে ২০-২৫টি টুটু বোর রাইফেল, দোনলা বন্দুক ও গুলি সংগ্রহ করা হলো। বন্দুক, ছোরা, তলোয়ার, ছুরি, রাম দা, বাঁশের লাঠিসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে যুবকেরা সাহারা ক্লাবে সমবেত হয়।

এর আগে ২৩ মার্চ পাবনাতে ব্যাপক মহড়া, গণমিছিল ও বিশাল জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১টার সময় পাবনা টাউন হলের ছাদে পাকিস্তানি পতাকা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন রফিকুল ইসলাম বকুল, ইকবাল হোসেন, জহুরুল ইসলাম বিশু, গোলাম মাহমুদ, শাহাব উদ্দিন চুপ্পু, ফজলুল হক মন্টু প্রমুখ। এ সম্পর্কে সাহাবুদ্দিন চুপ্পু বলেছেন : '২৩ মার্চ র‍্যালি শেষে আমরা পাবনা টাউন হলে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করি। সেখানে আমি, বকুল, বেবী, ইকবাল, লালু, বিশু, মন্টু, অখিল, উজ্জ্বল, মিতিল, রবি, জিন্নন প্রমুখ উপস্থিত ছিলাম। ঐদিন পাবনা কালেক্টরেটেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেখানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিল বেবী ইসলাম। এভাবে পাবনায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়।'

এমতাবস্থায় 'অপারেশন সার্চ লাইটে'র কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ২.৩০ টায় অর্থাৎ ২৬ মার্চ শুক্রবার রাজশাহী থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি পদাতিক সৈন্য পাবনায় এসে পৌঁছে। তারা অবস্থান নেয় বিসিক এলাকায়। এ-কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার ছিল ক্যাপ্টেন আসগার এবং ডেপুটি কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট রশিদ। এদের সঙ্গে ছিল তিনজন সুবেদার ও নায়েক সুবেদার র‍্যাঙ্কের সেনাসদস্যসহ মোট ১৩০ জন সৈন্য। পাবনায় কোনো বাঙালি আর্মি বা ইপিআর ছিল না। তাই পাকসেনারা আক্রমণ চালায় সাধারণ মানুষের ওপর। তারা ২৬ মার্চ আর্মি ভ্যানে চড়ে পাবনা শহরে টহল দিতে থাকে এবং বলতে থাকে : 'কারফিউ হো গিয়া হ্যায়, সব শালে ভাগ যাও।' সাধারণ মানুষ বিষয়টি বুঝে ওঠার আগেই বেলা ১১টার দিকে তারা অতর্কিতে তাদের ওপর গুলি চালায়। গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করেন অনেকেই। পাকসেনাদের নির্মমতার নিকৃষ্টতম উদাহরণ, শহরের আবদুস শুকুরের জানাজায় গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করা। এর ফলে শহরের পরিস্থিতি থমথমে হয়ে যায়, লোকজন দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। ঐ দিনের ঘটনা সম্পর্কে রবিউল ইসলাম রবি বলেছেন : 'বিকাল ৪টায় পাবনা পৌরসভার কৃষ্ণপুর গ্রামের কিছু সংখ্যক মুসল্লি কারফিউ ভঙ্গ করে ২৫ মার্চে নিহত শহীদ শুকুরের নামাজে জানাজা পড়ছিলেন। এমন সময় পাকসেনার ৮/১০ জনের একটি দল অতর্কিত হামলা চালায় এবং গুলিবর্ষণ করে। নিহত হন একই গ্রামের আব্দুস সামাদ। আহত হলেন শেখ বদিউজ্জামান, মাওলানা ইব্রাহিম খলিল ও ছামেদ। এরা সবাই গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনার সাথে সাথে পুলিশ লাইনে অবস্থানরত পুলিশ বাহিনী ও স্বাধীনতাকামী আবাল-বৃদ্ধ-ছাত্র-জনতা-পুলিশ পাক সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

২৬ মার্চ আর্মিরা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করে অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন এমপিএ, ব্যবসায়ী আবু সাঈদ তালুকদার, ডা. অমলেন্দু কুমার দাক্ষী, মোশাররফ হোসেন মোক্তার, আবদুল খালেক, কফিল উদ্দিন আহম্মেদ, রাজেমসহ অনেককে। এঁদেরকে বিসিক এলাকায় আটকে রেখে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। ২৭ মার্চ নরপিশাচরা হত্যা করে অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন, ডা. অমলেন্দু দাক্ষী, সাঈদ তালুকদার, রাজেমসহ অনেককে। ২৬ ও ২৭ মার্চ পাক আর্মিরা যাকে পায় তাকেই গুলি করে হত্যা করে। এরপর তারা পাবনা শহরে টহল দিতে থাকে এবং বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে পুরো শহরকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এদিকে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় পাবনাবাসীও প্রস্তুত ছিল সংগ্রামের জন্য। রণেশ মৈত্র লিখেছেন : '১ মার্চ থেকেই সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে লাগাতার হরতাল এমনিতেই চলছিল অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সারা পাবনাব্যাপী।' রফিকুল ইসলাম বকুল বলেছেন :

'২৩ মার্চ ১৯৭১ সালে পাবনাতে ব্যাপক মহড়া, গণমিছিল ও বিশাল জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন বেলা ১১টার সময় পাবনা টাউন হলের ছাদে পাকিস্তানি পতাকা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আমি বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। ... এরপর বিকেল ৪টার সময় পাবনা পুলিশ মাঠে স্বেচ্ছাসেবক সদস্যদের এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে আমাদের যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলতে থাকে।'

এদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অসহযোগ অব্যাহত রাখার, অফিস-আদালত বন্ধ রাখার এবং পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সকল আদেশ অমান্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন পাবনা জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের খান। তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং আর্মিরা পাবনায় এলে 'বাংলোর পেছন দিকের প্রাচীর টপকিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তারপর শহর থেকে উত্তরে, চর এলাকার একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করে, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সাথে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন।' পাবনার চর এলাকায় যে-সকল আওয়ামী লীগ নেতা আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা হলেন গণপরিষদ সদস্য আমজাদ হোসেন, আব্দুর রব বগা মিয়া, ওয়াজি উদ্দিন খান, ন্যাপ নেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা, ছাত্রলীগ নেতা আহমেদ রফিক, সোহরাব উদ্দিন সোবা, আব্দুস সাত্তার লালু, বেবী ইসলাম, রফিকুল ইসলাম বকুলসহ অনেক আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী। এ-সময় আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে আবদুর রব বগা মিয়া, নুরুল কাদের খান, আমিনুল ইসলাম বাদশা, অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন, প্রসাদ রায় প্রমুখকে নিয়ে একটি যুদ্ধকালীন হাইকমান্ড গঠিত হয়।

পাবনা জেলায় ২৫ মার্চ রাতে যে সব আর্মি আসে তারা পাবনার সংগ্রামী জনতার প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে এবং প্রত্যেকেই নিহত হয়। পাবনা শহরে ঢুকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকাল থেকেই পাকসেনারা পাবনা শহরের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা শুরু করে। আগে থেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা শহর থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও চর এলাকায় চলে যেতে থাকে। চরাঞ্চলে বসেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেয় পাকসেনাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ হোসেন, আব্দুর রব বগা মিয়া, ওয়াজি উদ্দিন খান, ন্যাপ নেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা, কমরেড প্রসাদ রায়, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুস সাত্তার লালু, বেবী ইসলাম, সোহরাব উদ্দিন সোবা, রফিকুল ইসলাম বকুলসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীর প্রচেষ্টায় এলাকার হাজার হাজার মানুষ প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

পুলিশ লাইন যুদ্ধ

২৭ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পুলিশ লাইনের দিকে রওনা হয়। আর্মিদের ট্রাকগুলো জজকোর্টের সামনে পৌছার সাথে সাথে শুরু হয় পুলিশদের প্রতিরোধ-আক্রমণ। পুলিশ সদস্যরা রেজিস্ট্রি অফিস, জজকোর্ট, পুলিশ লাইন, প্রধান ডাকঘর, জেলখানা প্রভৃতি ভবনের ছাঁদে অবস্থান নিয়ে পাকসেনাদের আক্রমণ করে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র' নবম খণ্ডে "সশস্ত্র প্রতিরোধ : পাবনা" অংশে উলেখ আছে : 'শহরের ডিসি ও এসপি স্থির করেছিলেন যে, শহর আক্রান্ত হলে তাঁরা প্রতিরোধ দেবেন। তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে পুলিশ ব্যারাকের ১০০ জন সশস্ত্র পুলিশও মনে মনে প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়েছিল। যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ এই শহরকে তারা পশ্চিমাদের হাতে ছেড়ে দেবে না। যেটুকু শক্তি আছে, তাই নিয়েই ওদের বিরুদ্ধে লড়বে। ২৭ মার্চ তারিখে সৈন্যরা পুলিশ ব্যারাকে যায় এবং পুলিশের অস্ত্রাগার তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পুলিশরা এতে অসামর্থ্য জানায় এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, ডিসি তাদের অস্ত্রাগার সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। তাঁর এই আদেশ কিছুতেই তারা অমান্য করতে পারবে না। এই নিয়ে দু'পক্ষের প্রথমে বাক-বিতণ্ডা এবং পরে গুলিবর্ষণ করে।... সৈন্যদের পরিবর্তে পুলিশরাই আগে আক্রমণ করল। এইভাবে অতর্কিতে চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ইয়াহিয়ার সুশিক্ষিত সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে গেল।' (পৃ. ৪২৩-৪২৪)

পুলিশরা বিভিন্ন ভবনের ছাঁদের উপরে থাকায় আর মিলিটারিরা খোলা আকাশের নীচের রাস্তায় থাকায় পুলিশদের সঙ্গে তারা টিকতে পারছিল না। তাই তারা হতাহতের সংখ্যা না বাড়িয়ে ইপিসিক ক্যাম্পের দিকে পিছু হটে চলে যায়। পেছন থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় তারা এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। এরপর আর্মিরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইপিসিক থেকে বের হয়ে আবারও পুলিশ লাইনের উপর আক্রমণ চালায়। তীব্র গোলাগুলির শব্দে স্থানীয় জনসাধারণ ও ছাত্ররা সংগঠিত হয়ে ২৮ মার্চ ভোরে দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মিলিটারিদের পেছন থেকে আক্রমণ করে। পুলিশরাও আরআই-এর নেতৃত্বে লড়াই চালিয়ে যায়। এক পর্যায়ে তারা গুলির সঙ্কটে পড়ে। এদিকে পাবনার সংগ্রামী ছাত্রজনতার আক্রমণে মিলিটারির একটি জিপ খাদে পড়ে যায় এবং একজন আর্মি নিহত হয়। দলনেতা রফিকুল ইসলাম

বকুল 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিয়ে ছাত্র-জনতাকে প্রেরণা যোগোতে থাকে। মুহুর্মুহু শ্লোগানে ও আক্রমণে চারদিক থেকে পাবনার বীরজনতা মিলিটারিদের হতবিহ্বল করে তোলে। একের পর এক খতম হয় পাকসেনা। বাকি সৈন্যরা রণেভঙ্গ দিয়ে টেলিফোন একচেঞ্জের সৈন্যদের সঙ্গে মিশে যায়। অন্যদিকে এসপি এবং আরআই তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্রাগার খুলে নিজেদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র রেখে সংগ্রামী জনতার মধ্যে বিতরণ করে দেয়। জেলখানার তালা ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। রফিকুল ইসলাম বকুল লিখেছেন : 'তখন সকাল ৯টা হবে। এদিকে পুলিশ লাইন মুক্ত হয়েছে; এই খবর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো। লোকজন এসে ভীড় জমাতে লাগলো। আরআই সাহেবের সহযোগিতায় ম্যাগাজিন রুম থেকে ৩০৩ রাইফেল ও গুলি আমরা বিতরণ করতে লাগলাম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ছেলেদের মধ্যে। এই সময় জেলখানার তালা গুলি করে ভেঙ্গে ফেলা হলো। কয়েদীরা মুক্ত হয়ে বাইরে চলে এলো।' (শতবর্ষপূর্তি উৎসব স্মারক, এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা, পৃ. ৮৬)।

লস্করপুর যুদ্ধ

লস্করপুরের যুদ্ধে সাধারণ জনগণের প্রতিরোধের মুখে পাকসেনারা পালিয়ে যায়। পরে জনতার এলোপাতারি আক্রমণে ঐ পাকসেনারা নিহত হয়। রাজশাহী থেকে 'রিকোয়েল লেস রাইফেল'সহ কয়েকজন সৈন্যসহ মেজর আসলামকে পাঠানো হয় পাবনায়। তারা এসেছিল বিসিকে আটকেপড়া সৈন্যদের উদ্ধার করতে। একইসাথে ফাইটার প্লেন থেকেও পাবনার জনতার ওপর গুলি চালানো হয়। এদিন শহরের বিভিন্ন স্থানে জনতার হাতে ১০-১৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। ময়লাগাড়ির কাছে (বর্তমান বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন এলাকায়) সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন শামসুল আলম বুলবুল, আবুল মহসিন বেগ মুকু, ডা. আমিনুল ইসলাম বেগসহ পাঁচজন।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ পুলিশ লাইন থেকে তাড়া খেয়ে এবং নাস্তানাবুদ হয়ে পাকসেনারা অবস্থান নেয় পাবনা শহরের তারাশ বিল্ডিং-এর পেছনে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। এরপর হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, সুসংগঠিত রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, পুলিশ মিলে চারদিকে থেকে তাদের ঘিরে ফেলে এবং যার কাছে যে-অস্ত্র ছিল তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে। খানসেনারাও বৃষ্টির মতো গুলি চালায়। 'স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র' থেকে জানা যায়–'২৮ মার্চ। ২৭ জন সৈন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে নিয়ে পাহারা দিয়ে চলছিল। চরের কৃষকরা ছুটতে ছুটতে এসে তাদের ঘেরাও করে ফেলল। তাদের হাতে লাঠিসোটা, বর্শা-বলম, তীর-ধনুক আরও কত রকমের হাতিয়ার। ব্যারাক থেকে সকল পুলিশ চলে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাছাড়া শহরের যুবক ও ছাত্ররা দলে দলে ছুটে এসে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত জনতা প্রায় ১৫ হাজারে এসে দাঁড়ালো। তাঁদের গগনবিদারী হর্ষধ্বনিতে সারা শহর কেঁপে উঠল, থরথরিয়ে কেঁপে উঠল অবরুদ্ধ পাক-সৈন্যদের মন। এবার দুপক্ষে গুলিবর্ষণ চলল। সৈন্যদের হাতে মেশিন গান ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। পুলিশরা শুধু রাইফেল নিয়েই লড়ছিল। জনতার মধ্যে যাঁদের হাতে বন্দুক ছিল, তাঁরাও সৈন্যদের লক্ষ করে গুলি চালাচ্ছিল। সৈন্যরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুরক্ষিত আশ্রয়ে থেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল। এদের মেশিনগানের অবিরল গুলিবর্ষণকে ভেদ করে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতোই দুঃসাহসের কাজ। সেই কারণেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। হাজার হাজার মানুষ এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোনো কার্যকর সাহায্য করতে না পারলেও তাদের আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি পাক-সৈন্যদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে তুলেছিল। তারা হতবুদ্ধির মতো হয়ে গিয়েছিল। তাই উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র হাতে থাকলেও তারা তাদের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেনি। এমনিভাবে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে এক এক করে তাদের ২৭জনই মারা গেল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্র মুক্তিবাহিনীর হাতে এসে গেল।' (নবম খণ্ড, 'সশস্ত্র প্রতিরোধ : পাবনা', পৃ. ৪২৪-৪২৫)

এ যুদ্ধে নিহত আনুমানিক ৩০ জন পাকসেনার লাশ তারাশ বিল্ডিং-এর পেছনে বেলগাছের পাশের গর্তে মাটিচাপা দেওয়া হয়। সৈন্যদের এলএমজি, চাইনিজ টমিগান, চাইনিজ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেড, প্রভৃতি হস্তগত হয় পাবনার সাহসী জনতার কাছে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ যুদ্ধের এক হৃদয় বিদারক যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন জহুরুল ইসলাম বিশু : 'ইতোমধ্যে এক বৃদ্ধ, হাতে তার দোনলা বন্দুক আর চারটি গুলি, ছুটে এসে বললেন, আর্মি দেখা যায় না? আমরা বললাম, না। তিনি দৌড়ে গিয়ে ওই ভেন্টিলেটর দিয়ে যেই মাথা বের করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি বুলেট এসে তার কপালে লেগে মাথার প্রায় অর্ধেক উড়ে গেল। তিনি মুহূর্তে বাথরুমের মধ্যে আমাদের সামনেই পড়ে গেলেন। ওনার রক্ত ও মাথার মগজের কিছু অংশ এসে লাগল আমাদের

জামাকাপড়ে। চোখের সামনে এ ধরনের দৃশ্য জীবনে প্রথম দেখে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম।' (*পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা*, পৃ. ৪১)

নগরবাড়ী ঘাট প্রতিরোধ যুদ্ধ

পাবনা শহরে প্রথম দফায় আর্থাৎ ২৫ মার্চ আসা সকল সৈন্য নিহত হওয়ার পর পাকবাহিনীর আলাদা দৃষ্টি পড়ে পাবনার ওপর। এদিকে পাকসেনাদের হত্যা করে পাবনার বীর জনতা আলাদা শক্তির সঞ্চার করে। তাঁরা পুনরায় পাকসেনাদের আগমনের শঙ্কায় থাকে এবং উত্তরবঙ্গের প্রবেশপথ নগরবাড়ী ঘাটে পাকসেনাদের প্রতিরোধ করার সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২ এপ্রিল পাবনার বীরজনতা বাঙ্কার তৈরি করে নগরবাড়ী ঘাটকে ছোটোখাটো এক দুর্গে পরিণত করে। ৪ এপ্রিল পাকসেনারা একটি ফাইটার বিমান থেকে হঠাৎ করে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং পাল্টা আক্রমণের মুখে ফিরে যায়। ৯ এপ্রিল শুক্রবার পুনরায় প্রবল শক্তি নিয়ে নগরবাড়ী ঘাটে বিমান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে পাকবাহিনী। এবারও প্রতিরোধ যোদ্ধারা পাল্টা জবাব দেয়। তাঁরা জানতে পারে আরিচা ঘাটে প্রচুর আর্মি এসে গেছে। ট্রাক, কামান, ট্যাংক, গানবোট–সবকিছু মিলিয়ে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। এতে পাবনার বীর সন্তানেরা প্রতিরোধ করার স্বপ্ন দেখতে থাকে। বাঙ্কার খুঁড়ে তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু ১০ এপ্রিল অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পাকবাহিনীর কাছে নগরবাড়ীর ঘাটে প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাঁদের প্রতিরোধ যুদ্ধ বেশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারে না। ফলে ১০ এপ্রিল নগরবাড়ী ঘাট পুরোপুরি পাকসেনাদের দখলে চলে যায় এবং ১১ এপ্রিল পাকবাহিনী পাবনা শহরে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। নগরবাড়ীর সেই ভয়াবহ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা লিখেছেন–'১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল, শনিবার। হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সকালে হঠাৎ করে ব্যাপকভাবে চতুর্মুখী আক্রমণ শুরু করে দিলে নগরবাড়ী ঘাটে। সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, যা এখন কল্পনাও করা যায় না। ... দুটি যুদ্ধ বিমান এসে ওপর থেকে বৃষ্টির মতো মেশিনগানের ব্রাশফায়ার শুরু করলো আমাদের লক্ষ করে। দূর থেকে অথবা নদীর মধ্যে গানবোট থেকে নিক্ষেপ করা ভারি মর্টারের শেল বিকট শব্দে আমাদের আশপাশে পড়তে শুরু করলো। যেখানে শেল এসে পড়ে সেখানে বিশাল গর্ত সৃষ্টি করে ধুলাবালি প্রায় হাজার ফুট ওপরে উঠে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।... মাঝে মধ্যে ভারি আর্টিলারির গোলা যখন নিক্ষেপ করছে তখন মাটি ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠছে। নগরবাড়ী বাজারের কয়েকটি গুদামে আগুন ধরে গেল।... আমরা পাবনাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারলাম না, নগরবাড়ী ঘাট পাকিস্তানি আর্মিদের দখলে চলে গেল।' (জহুরুল ইসলাম বিশু, পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা, পৃ. ৫৪-৫৫)। নগরবাড়ী ঘাট যুদ্ধে পাবনার দামাল ছেলেরা সাহসিকতার পরিচয় দিলেও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না থাকার কারণে তারা পাকবাহিনীকে পরাস্ত করতে পারেনি।

এভাবে ২৭ মার্চ পুলিশ লাইন যুদ্ধ, ২৮ মার্চ ইপিসিক শিল্পনগরীর যুদ্ধ এবং ২৯ মার্চ মাধপুর যুদ্ধ পাকবাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট' সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয়। জহুরুল ইসলাম বিশু লিখেছেন : '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে পাকিস্তানি আর্মি আক্রমণ শুরু করার পর তিনটি জেলায় আর্মিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এই জেলাগুলোর মধ্যে ছিল চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও পাবনা। চট্টগ্রাম জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট। ৪ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলায় সব পাকিস্তানি আর্মি নিহত হয় ইপিআর ব্যাটালিয়ন ও জনগণের আক্রমণে। ২৯ মার্চ অর্থাৎ বাংলাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম পাবনা জেলায় আগত সব পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয় শুধু পাবনার বিপ্লবী জনগণের আক্রমণে।'

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ

সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের কারণে এপ্রিলের মধ্যেই সংগ্রামরত মানুষের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। ২৬ মার্চ থেকেই সারা দেশে আক্রমণ চালাতে শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনী। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে বাঙালিরা। পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিটি জেলা ও প্রতিটি থানা সদরে আক্রমণ চালায়। সংগ্রামরত মানুষের প্রতিরোধ ভেঙে পাকিস্তানি বাহিনী স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে। ফলে বাংলাদেশের ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক সর্বস্তরের মানুষসহ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পাশের দেশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তারা শরণার্থীরূপে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সংগ্রামরত জনতা ভারতের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য তাই শরণার্থী শিবির থেকে যুবশিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়।২৫ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীর বাঙালি সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ মার্চ মাসের শেষ

কয়েকটি দিন তো বটেই কোথাও কোথাও এপ্রিলেও থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সুসংগঠিত পর্যায় শুরু হয় জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে কলকাতায় মেজর পদমর্যাদার ৮ জনকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ এক অধিবেশনে বসেন। অধিবেশন চলে ১১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। লে. কর্ণেল রব-কে চিফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আর বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। পাবনা ছিল ৭ নম্বর সেক্টরের অধীনে।

৭ নম্বর সেক্টর:

ক) এলাকা: সমগ্র রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা, দিনাজপুর ও রংপুরের অংশবিশেষ (দিনাজপুরের রাণীশঙ্কাইল-পীরগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ ও রংপুরের পলাশবাড়ী-পীরগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ)।

খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যা: আট

গ) সেক্টর ট্রুপস: ২,০০০ সৈন্য

ঘ) গেরিলা: ১০,০০০ সৈন্য

ঙ) সেক্টর কমান্ডার: প্রথমে মেজর নাজমুল হক, পরে মেজর কাজী নুরুজ্জামান। যুদ্ধের সময় এক সড়ক দুর্ঘটনায় মেজর নাজমুল হক নিহত হন।

অন্যদিকে পাবনায় পাকিস্তানি বাহিনী মোতায়েন করে ১২ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইটে'র কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যেসব পাকিস্তানি আর্মি পাবনায় আসে, তাদের সবাই হত্যা করে পাবনার ছাত্র ও মুক্তিকামী জনতা। এপ্রিল মাসের ১০ তারিখে নগরবাড়ি ঘাট দিয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাবনা শহরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনী। এর পর পাবনার দামাল সন্তানেরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ভারতে চলে যায়। কলকাতায় বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী কার্যালয় ছিল ৮ নং থিয়েটার রোড। সেখানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাবনার মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ট্রেনিং ক্যাম্পে অবস্থান ও ট্রেনিং গ্রহণ করেন। এই ক্যাম্পগুলো হলো–প্রিন্সেপ স্ট্রিট ক্যাম্প, কেচুয়াডাঙ্গা ক্যাম্প, পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্প, করিমপুর ক্যাম্প, দেরাদুন ক্যান্টনমেন্ট, হাফলং ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতি। মুক্তিযোদ্ধারা এসব স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে ট্রেনিং নেন এবং দেশে ফিরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

পাবনাসহ সারা দেশের এফএফ বাহিনীর ট্রেনিং হতো ভারতের বিভিন্ন স্থানে। স্থানগুলো হলো–১. বিহার প্রদেশের চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্ট, ২. দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্প, ৩. মেঘালয় রাজ্যের তুরা শহরের তেলঢালা পাহাড়ী এলাকার জঙ্গল, ৪. আসাম প্রদেশের ত্রিপুরা জেলার আগরতলার মেলাঘর, ৫. দার্জিলিং-এর মুরতি ক্যাম্প, ৬. আসামের শিলং এবং তোরা ট্রেনিং ক্যাম্প। এছাড়া বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের আরো বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেওয়া হতো।

(ক) প্রিন্সেপ স্ট্রিট ক্যাম্প: পাবনার মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্প ছিল ৪৫ প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা-১৩। এই বাড়ির মালিক ছিলেন ডা. বিধান রায়। ক্যাম্পের পাশেই ছিল সতু সান্যালের বাসা। এখানে কেবল পাবনা জেলা নয়, ঢাকাসহ অন্যান্য এলাকার মুক্তিযোদ্ধারাও আশ্রয় নিয়েছিলেন।

(খ) কেচুয়াডাঙ্গা ক্যাম্প: নদীয়া জেলার করিমপুর থানার কেচুয়াডাঙ্গা বিধানচন্দ্র বিদ্যানিকেতনে স্থাপন করা হয়েছিল পাবনার মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প। সুজানগরের আহমদ তাফজ উদ্দিন আহমেদ এমপিএ সার্বক্ষণিক এই ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। আবদুর রব বগা মিয়া প্রায়ই এটি তদারক করতেন। এখানে আসতেন এম মনসুর আলী, মোঃ নাসিম প্রমুখ নেতা। ক্যাম্প চালু হয়ে গেলে এখানে আসেন গোলাম হাসনায়েন এমপিএ, আবদুস সাত্তার লালু, ওয়াজি উদ্দিন খান, বেবী ইসলাম, গোলাম আলী কাদেরী, আওরঙ্গজেব বাবলু, ফেরদৌস শরীফ, তরিকুল আলম নিলু, তোফাজ্জল হোসেন তক্কেল, সাহাবউদ্দিন চুপ্পু, আতাউর রহমান আফতাব, চন্দন কুমার চক্রবর্তী, ইমদাদ আলী বিশ্বাস ভুলু, খসরু, আসাদ, শহিদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর, গোলাম হায়দার বাবলু, সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক, মো. শাহজাহান আলী, নবাব আলী মোল্লা, আজমল হোসেন লেবু, আব্দুল আউয়াল মুনু সর্দার, নিমাই চন্দ্র ঘোষসহ আরও অনেকে। এখানে সকাল-বিকাল পিটি-প্যারেড করানো হতো। প্রথমে এখানকার ট্রেনিং মাস্টার ছিলেন আব্দুল হাই। পরে আসেন পাবনার আরআই আবুল খায়ের। কেচুয়াডাঙ্গার প্রায় আধা কিলোমিটার পাশে পাবনার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আরেকটি 'ট্রানজিট ক্যাম্প' স্থাপন করা

হয়েছিল। পাবনার যোদ্ধাদের কেচুয়াডাঙ্গা ক্যাম্প থেকে আর্মি ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হয় বহরমপুরে, তারপর ট্রেন ও আমি ভ্যানে নেওয়া হতো পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্পে। ট্রেনিং দিতেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এস কে দত্ত, আকবর খানসহ আরো কয়েকজন। ট্রেনিং-এর পর নিয়ে যাওয়া হতো বালুঘাট ক্যাম্পে। এর পর মালদহের মেদিনীপুর থেকে তারা ৭ নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

(গ) শিকারপুর ক্যাম্প: রাজা মিয়া এমপিএ-এর শিকারপুর ক্যাম্পেও পাবনার মুক্তিযোদ্ধারা থাকতেন। এই ক্যাম্পের পরিচালক ছিলেন চারজন ইপিআর সদস্য।

(ঘ) পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্প: ভারতের পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্পে পাবনার ৩৬ জনের একটি গ্রুপ ট্রেনিং গ্রহণ করে ৭নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। এর প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন সাঁথিয়ার মোঃ নিজাম উদ্দিন, গ্রুপ লিডার ছিলেন পাবনার চন্দন কুমার চক্রবর্তী। এখানে অন্যান্য যাঁরা ট্রেনিং নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন–কাজী সদরুল হক সুধা, ঈশ্বরদী; সিরাজুল ইসলাম মন্টু, ঈশ্বরদী; শহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, আতাইকুলা; মোজাফফর হোসেন, কৃষ্ণপুর; তক্কেল, হেমায়েতপুর; আবদুল হাই মাহমুদ বাদশা, গোপালপুর; মনছুর রহমান, সুজানগর; মোজাম্মেল হক ময়েজ, চাটমোহর; সামছুদ্দিন, কুঠিপাড়া; ইউসুফ, পৈলানপুর; নাছিম, বেলতলা; রহমান, চর দুলাই; আক্কাস, সলিম, রঞ্জু, বনগ্রাগ; মোরশেদ, নজরুল, তোতা, আলো, আটঘরিয়া প্রমুখ। ট্রেনিং শেষে তাঁরা মেজর ইদ্রিস, ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের কমান্ডে শ্রীপুর আমবাগান, দলদলিয়াসহ চাপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেছেন।

(ঙ) করিমপুর ক্যাম্প: পাবনার যোদ্ধাদের জন্য একটি ক্যাম্প ছিল ভারতের নদীয়া জেলার করিমপুর থানায়। পাবনার কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ মোজাফফর), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)–এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বাম সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা এই ক্যাম্পটি পরিচালনা করতেন। কমরেড প্রসাদ রায়, আমিনুল ইসলাম বাদশা, রণেশ মৈত্র, জাহিদ হাসান জিন্দান প্রমুখ নেতা এই ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। এই ক্যাম্প থেকে পাবনার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হতো আসামের তেজপুর এলাকার সেলুনবাড়ি ক্যান্টনমেন্টে। এছাড়া নারী মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল এই ক্যাম্পে ছিলেন।

(চ) জলঙ্গী ক্যাম্প: পাবনার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি সাব-ক্যাম্প করা হয়েছিল জলঙ্গীতে। এই ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শামসুর রহমান শরিফ ডিলু, মহিউদ্দিন আহমেদ, মো. নুরুল ফকির, মো. চাঁদ আলী, আবদুল খালেক মুকুল, ওয়াজি উদ্দিন খান, তোজাম আলী মিয়া প্রমুখ।

(ছ) চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্প: বিহার প্রদেশের চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাবনার বহু মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলেন। ৩৮ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে পাবনা জেলার ৭৩ জন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে আগস্টের ২ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ধুলাউরি, লালগোলা, বাবুল-তলী, শেখপাড়া, গোধনপাড়া বর্ডারগুলোতে মোট ৬টি যুদ্ধে অংশ নেন। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে তাঁরা ৭ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বে রাজশাহীর কাটাখালি ব্রিজ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এ সব যুদ্ধে অংশ নেন মো. আওরঙ্গজেব, মকবুল হোসেন সন্টু, এম এম গাজী মোজাহারুল হক প্রমুখ।

(জ) দেরাদুন ও চাকতারা ক্যান্টনমেন্ট: ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি, দেরাদুনে মুজিববাহিনীর প্রথম ব্যাচের এ-গ্রুপে বাংলাদেশের মোট ২৯৫ জন ট্রেনিং গ্রহণ করেন। এর মধ্যে পাবনা জেলার ১৫ জন ছিলেন। এঁরা হলেন: ১. মো. ইকবাল হোসেন; ২. মো. জহুরুল ইসলাম বিশু; ৩. মো. আব্দুর রাজ্জাক মুকুল; ৪. মো. গোলাম মাহমুদ; ৫. আবদুর রাজ্জাক রিদ্দিক; ৬. মো. হানিফ হোসেন বাবু; ৭. আবুল কালাম আজাদ বাবু; ৮. মো. ইসমত হোসেন; ৯. জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম; ১০. সাইফুল ইসলাম রানু; ১১. মো. শাহনেওয়াজ খান হুমায়ুন; ১২. মো. ফজলুল হক মন্টু; ১৩. মো. আব্দুল হান্নান; ১৪. মো. শাহ আলম খান; ১৫. মো. আবদুল হাই মঞ্জু। (পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা, পৃ. ১০৯)

দেরাদুনের চাকতারা ক্যান্টনমেন্টে দ্বিতীয় ব্যাচে এ-গ্রুপে ট্রেনিং নিয়েছিলেন ৪০ জন; এঁরা হলেন–মো. শাহজাহান আলী, আটঘরিয়া; মো. ইসমাইল হোসেন মেছের, আবদুল মতিন আহমেদ জিন্নাহ, এ কে এম শরিফুল ইসলাম, আ স ম আব্দুর রহিম পাকন, আ ন ম মেসবাহুর রহমান রোজ, মো. রেজাউল করিম রেজা, মো. আতিয়ার রহমান সাচ্চু, শহীদুল্লাহ

আহম্মদ বকুল, মো. মোশাররফ হোসেন মুছা, মো. মজিদুল হক মণি, মো. শফিকুল ইসলাম শফি, নুরুজ্জামান বিশ্বাস, ঈশ্বরদী; মো. আনিছুর রহমান আনিছ, ঈশ্বরদী; মো. তপন, মান্নান মণ্ডল, ঈশ্বরদী; মো. সেলিম, ফরিদপুর; মো. আব্দুল মান্নান, ফরিদপুর; মো. আবদুল লতিফ, ফরিদপুর; মো. চঞ্চল হোসেন, চাটমোহর; মো. আবদুল গনি, চাটমোহর; মো. আজাদ, ঈশ্বরদী; মো. আলাউদ্দিন চাঁদ, ঈশ্বরদী; মো. আরজু, ঈশ্বরদী; মো. মতিয়র রহমান মতি, বেড়া; মো. আশরাফ আলী, বেড়া; মো. সিরাজুল ইসলাম, বেড়া; মো. মধু মিঞা, মো. আপেল, মো. সামসুল ইসলাম, সুজানগর; মো. আব্দুস সামাদ, সুজানগর; মো. আফতাব উদ্দিন, সাঁথিয়া; মো. আব্দুল লতিফ, সাঁথিয়াসহ মোট চল্লিশ জন। (পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা, পৃ. ১২১)

এর পর মুজিব বাহিনীর তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যাচে চাকতারা ক্যান্টনমেন্টে পাবনার প্রায় ২০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা হলেন– মোখলেছুর রহমান মুকুল, মো. আব্দুর রাজ্জাক, সুজানগর; মো. সাইফুল আলম বাবলু, নূরুল ইসলাম নূর, সুজানগর; অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু, পাবনা; হাবিবুর রহমান মালিথা, ঈশ্বরদী; এনামুল বারী ডাবলু, মো. রেজাউল হক রেজা, মো. মমতাজ উদ্দিন মন্টু, দোগাছি; সেন্টু, হাসান, হুসেন, মো. আবদুল মালেক খান, মো. মহসিন আলী, মো. নাবিউল হক চুকু, মতিয়ার রহমান মতি, গোপালপুর; প্রফুল্ল মোহন চৌধুরী, এবাদত আলী পাশা, আটঘরিয়া; মো. কালু প্রামাণিক, আটঘরিয়া; ইমদাদ আলী বিশ্বাস ভুলু, মো. আব্দুল জলিল, মো. আবদুল মান্নান, রাধানগর; মো. শাহাদৎ হোসেন সন্টু, মো. ফারুক আলী রমজান, মো. আতিয়া রহমান সাচ্চু, মো. আবদুল মান্নান, আটুয়া; মো. আসাদুল ইসলাম রতন, মো. নুরুজ্জামান বিশ্বাস, পৈলানপুর; মো. মিজানুর রহমান, খন্দকার আবুল কালাম আজাদ, গোপালপুর; সুলতান মাহমুদ চৌধুরী খসরু, গোপালপুর; মো. রবিউল হোসেন, মো. আব্দুল মুন্নাফ, কৃষ্ণপুর; দেলোয়ার হোসেন দিলু, কৃষ্ণপুর; এস এম ইব্রাহিম, আবুল হোসেন হাঙ্গেরী, গোবিন্দা; দেওয়ান মাহমুদুল হক দুলাল, পৈলানপুর; মো. মনজুর রহমান বিশ্বাস, ঈশ্বরদী; মো. আবদুস সামাদ, ঈশ্বরদী; মো. আব্দুর রাজ্জাক, ঈশ্বরদী; মো. সুজাউদ্দিন সরকার, বেড়া; মো. আলতাফ মাহমুদ, বেড়া; মো. আব্দুল হান্নান, ভাঙ্গুরা; খলিলুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার, ফরিদপুর; মো. আবদুস সামাদ, চাটমোহর; মো. আবদুল মতিন, রাধানগর; মো. বাবলু, রাধানগর; প্রভাত ডি কস্তা, চাটমোহর; আদম ডি কস্তা, চাটমোহর; ইগনেসিউজ গমেজ, চাটমোহর; অমল ডি কস্তা, চাটমোহর; ওয়ালটার ডি কস্তা, চাটমোহর; দুলাল চন্দ্র কর্মকার, চাটমোহর; মো. আতাউর রহমান, রাধানগর; মো. চুনু, নয়নামতি; মো. মহসিন, সিঙ্গা; আনোয়ার হোসেন, আটঘরিয়া; লোকমান হোসেন, আটঘরিয়াসহ আরো অনেকে। (পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা, পৃ. ১২১-১২২)

এই ট্রেনিং ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল বুইক। ডেপুটি ইনচার্জ ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রকাশ চন্দ্র পুরকায়স্থ। দেরাদুন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রকৃত কোনো ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল না। এখানে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হতো। প্রকৃত টেনিং দেওয়া হতো দেরাদুন থেকে ৯২ কিলোমিটার দূরে দুর্গম পাহাড়ী এলাকা চাকতারা ক্যান্টনমেন্টে।

(ঝ) হাফলং ক্যান্টনমেন্ট: ভারতের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত হাফলং ক্যান্টনমেন্টে মুজিব বাহিনীর প্রথম ব্যাচের বি-গ্রুপে ট্রেনিং নিয়েছিল বাংলাদেশের মোট ৪৭৫ জন। এর মধ্যে পাবনার ছিলেন ২১ জন–এঁরা হলেন–১. বেবী ইসলাম; মো. হাবিবুর রহমান হাবিব; ৩. গোলাম সারোয়ার খান সাধন; ৪. মো. আব্দুল হামিদ; ৫. নজরুল ইসলাম সাচ্চু; ৬. মো. শওকত বাবলু; ৭. মো. ফকরুল ইসলাম; ৮. মো. রুহুল আমীন রুকু; ৯. মো. দুলাল হোসেন দুলাল; ১০. মো. গোলাম আজিজ জিলানী; ১১. আহমেদ করিম; ১২. এমদাদুল হক পান্না; ১৩. আহমেদ শফিক; ১৪. মো. রবিউল আলম টুকু; ১৫. মো. আব্দুল মতিন খান রাজ্জাক; ১৬. আলমগীর কবীর স্বপন; ১৭. মো. নুরুল ইসলাম নুরু; ১৮. মো. আলমগীর খান বেলাল; ১৯. মো. শরিফুল ইসলাম ইঞ্জিনিয়ার; ২০. মো. মহিউদ্দিন বুদু; ২১. মো. সাইফুল ইসলাম মুন্নু।

দ্বিতীয় ব্যাচে হাফরং ক্যান্টমেন্টে পাবনার আরও ৪৫ জন গিয়েছিলেন। এঁরা হলেন–মো. বৈরাম খান, মো. আব্দুল মান্নান চয়েন, মো. গিয়াস উদ্দিন, মো. রবিউল ইসলাম রবি (ডিলার), মো. মহররম, মো. সহিদুল ইসলাম (সায়দু), মো. আকমল হোনের এসও, মো. নবাব অলী, মো. আব্দুল্লা হেলাল কাফী, মো. আব্দুল আজিজ মালিথা, মো. মাহতাব উদ্দিন প্রাং মানিক, মো. লোকমান হোসেন সাঁথিয়াসহ মোট ৪৫ জন। (পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা, পৃ. ১২১)

ট্রেনিং শেষে মুজিব বাহিনীর প্রথম গ্রুপটি পাবনায় প্রবেশ করেন আগস্ট মাসে। এর পর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে পাবনায় প্রবেশ করেন এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর ও নকশালদের পর্যুদস্ত করেন।

ধ্বংস ও নির্যাতন

পাকিস্তানি হানাদাররা রাজাকার ও সহযোগী দালালদের মাধ্যমে তালিকা তৈরি করে সারাদেশের মানুষের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে, হত্যা করেছে লাখ লাখ মানুষকে। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর নির্যাতনের চিহ্ন শরীরে ধারণ করে বেঁচে থাকা অসংখ্য নারী-পুরুষের প্রত্যক্ষ বর্ণনা থেকে শফিউদ্দিন তালুকদার তার 'একাত্তরের গণহত্যা যমুনার পূর্ব-পশ্চিম' বইয়ে নির্যাতন ও গণহত্যার ধরনগুলো তুলে ধরেছেন। সেই বর্ণনায় পুরুষ নির্যাতন প্রসঙ্গে যে ধরনগুলো উঠে এসেছে, সেগুলো হলো–

১. উল্টো করে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে পেটানো।
২. হাত ও পায়ের নখের ভেতর দিয়ে বড় বড় সূঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া।
৩. চিমটা দিয়ে হাত ও পায়ের নখ টেনে তোলা।
৪. হাত-পা বেঁধে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অথবা ব্লেড দিয়ে শরীরের চামড়া চিড়ে রক্তাক্ত শরীরে লবণ ও শুকনো মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে দেওয়া।
৫. হাত-পা বেঁধে উলঙ্গ করে প্রখর রোদে ফেলে রাখা।
৬. চিমটা দিয়ে মাথার চামড়াসহ চুল টেনে তোলা।
৭. ছুরি দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলা।
৮. বিশেষ ধরনের বাক্সে বসিয়ে শরীরে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া।
৯. বুকের নীচে বাঁশদণ্ড রেখে পিঠসহ সর্বাঙ্গে বুট দিয়ে পদদলিত করা।

এছাড়াও নারী, পুরুষ ও শিশুদের ওপর এমনভাবে নির্যাতন চালিয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।
হত্যার ধরন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

১. বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা।
২. গাছের সাথে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাইফেলের বাট দিয়ে অথবা লাঠি দিয়ে প্রহার করতে করতে হত্যা করা।
৩. গুলি করে হত্যা করা।
৪. আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা।
৫. গাছের সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করা।
৬. সিরিঞ্জ দিয়ে দেহ থেকে রক্ত নিয়ে রক্তশূন্য করে হত্যা করা।
৭. বৈদ্যুতিক শক দিয়ে হত্যা করা।
৮. সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা।
৯. জ্যান্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা।
১০. বস্তায় ভরে অথবা হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে হত্যা করা।
১১. শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে হত্যা করা।
১২. জিপের পেছনে বেঁধে দ্রুতবেগে জিপ চালিয়ে টেনে হিঁচড়ে হত্যা করা।
১৩. গ্রেনেডের পিন খুলে হাতে দিয়ে দৌড়ে পালানোর কথা বলে গ্রেনেড বিস্ফোরণে হত্যা করা।
১৪. পানিতে চুবিয়ে হত্যা করা।
১৫. শিশুদেরকে দুই পা ধরে গাছের সাথে কিংবা ঘরের খুঁটির সাথে আঘাত করে হত্যা করা।
১৬. ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা হত্যাকাণ্ডে বুলেট ব্যবহার করেনি। এক্ষেত্রে তারা কখনো বেয়নেট দিয়ে আবার কখনো জবাই করে হত্যার কাজ শেষ করে লাশগুলো ডোবা-নালায় ফেলে দিয়েছে।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নগরবাড়ি ঘাট দিয়ে পাবনায় প্রবেশ করে পরের দিন দ্বিতীয় দফা পাবনা শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে পাকবাহিনী। তারা একে একে জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। থানা সদর ও গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে পাকসেনা ও তাদের এদেশীয় দোসররা। জেলার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তারা গণহত্যা চালায়। পাকবাহিনীর গণহত্যার স্থানগুলো হল: পাবনা সদর–বিসিক শিল্পনগরী, নূরপুর ডাকবাংলো, ওয়াপদা কলোনী, এডওয়ার্ড কলেজ, নাজিরপুর, বাঙ্গাবাড়িয়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, সমশপুর, মনোহরপুর, মাধপুর, টিকোরী; ঈশ্বরদী থানা–ঈশ্বরদী শহর, পাকশী, পাকুড়িয়া, দাশুড়িয়া, দাদাপুর, বাঁশেরবাদা, মীরকামাড়ি, মুলাডুলি ও বিমানবন্দর এলাকা; আটঘরিয়া থানা–গড়োড়ী,

লক্ষ্মীপুর; চাটমোহর থানা–চাটমোহর বাজার, ফৈলজানা; ফরিদপুর থানা–ডেমরা, হাদল; সুজানগর থানা–সাতবাড়িয়া, সুজানগর প্রভৃতি এলাকা; সাঁথিয়া থানা–ধুলাউড়ি, শহিদ নগর (ডাববাগান); বেড়া থানা–বেড়া সদর ও নগরবাড়ী ঘাট। পাবনা জেলার যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ: সদর থানা–পাবনা পুলিশ লাইন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পুরাতন ভবন, লস্করপুর, বালিয়াহালট, মালিগাছা, বাঙ্গাবাড়িয়া, নাজিরপুর, মাধপুর ও তারাবাড়িয়া; ঈশ্বরদী থানা–দাশুরিয়া, মুনসিদপুর, পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বিমানবন্দর প্রভৃতি এলাকা; আটঘরিয়া থানা–বংশীপাড়া, হাঁপানিয়া, আটঘরিয়া থানা, বেলদহ প্রভৃতি এলাকা; চাটমোহর থানা–কৈডাঙ্গা ব্রিজ, চাটমোহর থানা; ফরিদপুর থানা–মাজাট, কালিয়ানী, ফরিদপুর থানা; সাঁথিয়া থানা–শহিদনগর (ডাববাগান), ধুলাউড়ি, নন্দনপুর প্রভৃতি এলাকা; বেড়া থানা–নগরবাড়ী ঘাট, বাঘাবাড়ী ঘাট এলাকা; সুজানগর থানা–সুজানগর, বনগ্রাম, বালিয়া ডাঙ্গি, সাতবাড়িয়া, সুজানগর থানা।

সাধারণ মানুষকে নির্যাতন ও হত্যার বিবরণ

পাবনায় পাকবাহিনী ও তার দোসরদের ঘৃণিত কর্মকাণ্ডের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় জহুরুল ইসলাম বিশুর 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা', আবুল কালাম আজাদের 'মুক্তিযুদ্ধের কিছুকথা: পাবনা জেলা', এডভোকেট আমজাদ হোসেনের 'বিস্মৃত প্রায়', সাইদ হাসান দারার 'মুক্তিযুদ্ধ পাবনা' প্রভৃতি গ্রন্থে। এসব গ্রন্থের আলোকে আমরা সেসব বিবরণ তুলে ধরবো। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ পাবনা প্রথম ধাপে শত্রুমুক্ত হয়। এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবল শক্তি ও অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ১০ এপ্রিল নগরবাড়ি ঘাট দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা পাবনা প্রবেশ করে। বেবী ইসলাম বলেছেন: 'পাকিস্তানি সৈন্যরা পাবনা জেলায় অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশি হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালায়, কারণ প্রথম ধাপে আসা সকল সৈন্যকেই পাবনার বীর জনতা হত্যা করেছিল।' ১৬ ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈন্যরা ১১ এপ্রিল পাবনা শহর ও সন্ধ্যায় ঈশ্বরদীর হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। জহুরুল ইসলাম বিশু লিখেছেন: 'পাবনাকে তারা উত্তরবঙ্গের প্রধান ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে গড়ে তোলে।' 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা' বইতে তিনি আরও লিখেছেন: '১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হায়েনার দল পরিকল্পনা করেছিল বাঙালি জাতিকে চিরতরে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলবে। এ কারণে তারা গঠন করে বিভিন্ন ঘাতক দালাল বাহিনী। এ দেশের পাকিস্তান সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলো ও সমাজের কিছু নিকৃষ্ট স্তরের লোকজনের নেতৃত্বে গঠন করে শান্তি কমিটি এবং চোর-ডাকাতসহ বিভিন্ন পাকিস্তানপন্থিদের নিয়ে গঠন করে রাজাকার, আল-বদর, আল শামস বাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ফ্রন্টিয়ার ও ওয়াজিরিস্তান থেকে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের এবং পাকিস্তান জেলখানার দাগি আসামীদের নিয়ে এসে তাদের দিয়ে গঠন করে মিলিশিয়া বাহিনীর সশস্ত্র সৈনিক দল।'

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ২০০৭ সালের ১৭ এপ্রিল দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় লেখেন: 'পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য সশস্ত্র রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে জামায়াত, মুসলিম লীগ এবং স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের নেতৃবৃন্দ জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অধীনে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি গ্রামগঞ্জ থেকে এক লাখ সশস্ত্র রাজাকার, আলবদর বাহিনী গড়ে তোলার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে। তারা ৫০ হাজার রাজাকার, আলবদরকে সশস্ত্র ট্রেনিং দেয় এবং উন্নত ধরনের অস্ত্র দাবি করে। তারা নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, গুম, অগ্নিসংযোগ, সম্পদনাশ এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সে কারণে রাজাকার, আল বদর বাহিনীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সহযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলে। তারা পাকিস্তানি সোবাহিনী থেকে অর্থ, অস্ত্র ও রেশন পেত। আলবদর বাহিনী গঠিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও গণহত্যার জন্য। আলবদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিজামী। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল গ্রাম-গঞ্জে প্রত্যেকটি এলাকায় খুঁজে খুঁজে শত্রুর শেষ চিহ্ন মুছে ফেলতে। ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় মতিউর রহমান নিজামী বলেন: 'বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে ৩১৩ যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।'

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী নগরবাড়ি ঘাট দিয়ে দ্বিতীয় দফায় পাবনায় প্রবেশ করে। ১১ এপ্রিল বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শেলিং করতে করতে পাবনা শহরের দিকে যাত্রা করে। যাওয়ার সময় তারা রাস্তার দু-পাশের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। অনেক সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। এভাবে দ্বিতীয় দফায় বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সৈন্যরা পাবনা শহরে প্রবেশ করে। বিকাল চারটায় পাবনা শহরের মহেন্দ্রপুরে পৌঁছে তারা হত্যা করে পাবনা সদর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোবাহান চেয়ারম্যানকে। এরপর সুইপার কলোনীর সামনে অনন্ত মোড়ে হত্যা করে গোলাম মোস্তফা আদ্দিকে। 'সে রাস্তার পাশে রিকশায় বসে ছিল। আর্মিরা তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। সেই লাশ ওই রিকশার ওপরেই পড়ে থাকে। কয়েকদিন ধরে পচে-গলে, শেয়াল-কুকুরের আহার হয় তার মরদেহ।'

১১ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা পাবনা শহরের ভেতরে ঢুকে পুলিশ লাইন, সার্কিট হাউস, নূরপুর ডাকবাংলো, বিসিক ও ওয়াপদার দিকে যায়। একটি দল রক্ষাকালীমন্দিরের কাছে গিয়ে মন্দিরে আশ্রয় নেওয়া লোকজনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কিছু লাশ মাটিচাপা দেওয়া হয়। হিন্দুদের লাশগুলো সৎকার করা সম্ভব হয়নি বিধায় শেয়াল-কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়। সোনাপট্টির ঔষধের দোকানের মালিক ডা. বিভূতিভূষণ সাহার লাশটিও সেখানে পচে-গলে মাটিতে মিশে যায়।

এর পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা পুলিশ লাইনে প্রবেশ করে পুলিশ সদস্যদের অনেককে হত্যা করে। সারা পাবনা শহরকে তারা আতঙ্কের নগর আর মৃত্যুপরীতে রূপান্তর করে। রাতে ভেরিলাইট জ্বালিয়ে শহর আলোকিত করে এবং মানুষজন কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা খুঁজতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা পাবনা শহরে প্রধান আস্তানা গড়ে তোলে রাধানগরের নূরপুরে অবস্থিত ওয়াপদা বা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিভাগীয় অফিস চত্বরে। ১১ এপ্রিল রাতেই আর্মিদের একটি দল অবস্থান নেয় পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজে। আর্মিদের অফিস ও বিচারিক দপ্তর স্থাপন করা হয় জেলা পরিষদ ভবনে। পাবনা পলিটেকনিকেও তারা অবস্থান নেয়। ডিগ্রি কলেজের বিল্ডিংয়ে তারা আরেকটি ক্যাম্প তৈরি করে। নূরপুর ডাকবাংলো ছিল আর্মি অফিসারদের আস্তানা। সার্কিট হাউসের চারদিকে ভারি অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়, যার নমুনা হিসেবে সেখানে এখনও একটি এ্যান্টি এয়ারক্র্যফট গান রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসাররা সার্কিট হাউসে এসে অবস্থান করতো।

পাবনা শহর দখল করার পর আর্মিরা বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট স্থাপন করে। বালিয়া হালট ব্রিজ, লস্করপুর তিনমাথা, টেবুনিয়া বাজার, দাশুরিয়া মোড়, ঈশ্বরদীর আলহাজ মোড়, আতাইকুলা বাজার, কাশিনাথপুর মোড়, কালীদহ মোড় প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তানি আর্মিরা চেকপোস্ট স্থাপন করে। চেকপোস্টগুলোতে বিভিন্ন স্থানে চলাচলকারী মানুষজনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো। জহুরুল ইসলাম বিশু লিখেছেন : "রাস্তায় কোনো মানুষ পেলেই পাকিস্তানি আর্মিরা তাকে জিজ্ঞেস করতো 'ডান্ডি কর্ড কাঁহা হ্যায়?' আইডেনটিটি কার্ড দেখানোর পরও যদি সন্দেহ হতো তা হলে বলতো, 'একঠো সুরা বোলো'। সুরা বললেও বিশ্বাস করতো না। হিন্দু না মুসলমান দেখার জন্য বলতো, 'তোমহারা কাপড়া উতারো।"

জহুরুল ইসলাম বিশুর 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায়: 'পাকিস্তানি আর্মিরা পাবনা দখলের কিছুদিনের মধ্যেই পাবনায় শান্তি কমিটি গঠন করে। এই জেলা কমিটির প্রধান ছিলেন মওলানা সাইফুদ্দীন এহিয়া। পাবনা সদর সাব-ডিভিশন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি হয় যথাক্রমে ক্যাপটেন আসগার হোসেন জায়েদী এবং মওলানা আবদুস সুবহান। এ কমিটিতে আরো ছিলেন–ওসমান গনি খান, চরতারাপুর; মোফাজ্জল হোসেন ডাক্তার, লাইব্রেরি বাজার; মোজাহার হোসেন, লাইব্রেরি বাজার; অ্যাডভোকেট মোসলেম তালুকদার, বাণী সিনেমা হলের পেছনে; সাহেদ আলী প্রামাণিক, কৃষ্ণপুর; আবদুর রাজ্জাক, আমিন উদ্দিন মিয়া, মোসলেম উদ্দিন মোল্লা, আতাইকুলা; ডা. আবদুর রহমান, সাঁথিয়া; ডা. করিম বক্স সরদার, সাঁথিয়া; গাজিউর রহমান, দিলালপুর; খবির উদ্দিন বিশ্বাস, কৃষ্ণপুর; খন্দকার নুরুদ্দিন, রাধানগর; আনা জোয়ার্দার আলী, কুঠিপাড়া; হাসান খাঁ, দিলালপুর; বদরুদ্দোজা চৌধুরী, রওশনজান চৌধুরী, কোবাদ হোসেন, দিলালপুরসহ আরো অনেকে। পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন নেজামে ইসলাম দলের নেতা পাবনার মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক।' (পৃ. ৬২-৬৩)

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হাবিবুর রহমান স্বপনের 'আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক লেখা থেকে জানা যায়: 'এ সময় মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে সাঁথিয়া ফকিরপাড়ার এক দল যুবক (আব্দুস সাত্তার, আব্দুস সামাদ, শুকুর আলী, আব্দুল কাদের, খবির উদ্দিন, শামসুল ইসলাম এবং নিজামীর মামাতে ভাই ফরুক হোসেনরা) জামায়াত ইসলামীর পক্ষে মিছিল করতো। তাদের বিরোধিতা স্পষ্ট হতে থাকে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর। এরাই পরে মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদর ও রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়।'

সাঁথিয়া থানার ধুলাউরিতে জামায়াতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ লিখেছেন: 'ধুলাউরি ইউনিয়নে জামায়াতের শক্ত ঘাঁটি ছিল। ধুলাউরি মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষক প্রকাশে জামায়াত ও ইসলামী ছাত্র সংঘের সক্রিয় সদস্য ছিল। '৭০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ধুলাউরি বাজারে জনসভা করার সময় জামায়াতের লোকজন সরাসরি আমাদের জনসভায় আক্রমণ করে এবং মাইক কেড়ে নেয়। ইব্রাহিম নামে এক কর্মীকে আহত করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার বাহিনী ইব্রাহিমকে হত্যা করে। ঐ সময় আব্দুল আউয়াল মাস্টার আওয়ামী লীগকে সাহায্য করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের মনিরুজ্জামান, মৌলভী মো. আলী, ধুলাউরির আব্দুল হামিদ খান প্রমুখের নেতৃত্বে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে জামায়াত আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগের কাশেম সর্দার (শহিদ), ডা. আব্দুল মোমিন, মহির উদ্দিন (মাস্টার), আইনুল হক (মাস্টার), ইউসুফ আলী (মাস্টার), আশরাফ (মাস্টার), আজিজুল হক ও কিশোরদের মধ্যে উৎসাহী জামাল উদ্দিন

প্রমুখ সেই আক্রমণ প্রতিহত করলেও আতঙ্কে লোকজন চলে যায়। মিটিং পণ্ড হয়ে যায়। এর সাতদিন পরেই পুনরায় জনসভা করলে ব্যাপক লোকসমাগম হয় এবং সবাইকে লাঠি হাতে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এতদঞ্চলে আওয়ামী লীগ সংগঠন গড়ে তোলা ছিল কষ্টকর কাজ। জনগণ ভয়ে আওয়ামী লীগের নাম মুখে আনেনি। জামায়াতের লোকজন তখনও প্রচার করে যে, আওয়ামী লীগ 'আল্লাহর ঘর পাকিস্তান' ভেঙে ফেলবে। 'মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজী'–এই শ্লোগান নিয়ে তারা সর্বত্র প্রচার চালায়।'

১৯৭১ সালে পাবনা জেলায় সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পাকবাহিনীর তিনজন মেজর, যথাক্রমে–মেজর হামিদ, মেজর নেওয়াজ ও মেজর আসলাম মাহমুদ খান।

পাবনা শহরে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করার মূল ভূমিকা পালন ও পরিকল্পনাকারী ছিল ক্যাপ্টেন জায়েদী। সে ১৯৬৫ সালে পাবনা থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে বিডি মেম্বারদের ভোটে এম এন এ নির্বাচিত হয়। পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে সবচেয়ে বিশ্বাস করতো। পাবনায় শান্তি কমিটির অফিস হিসেবে ব্যবহার হতো পরিতোষ ডাক্তারের বাড়িটি। জহুরুল ইসলাম বিশু লিখেছেন : 'পরিতোষ ডাক্তারের জিপটি ব্যবহার করতো মওলানা সুবহান। দেশ স্বাধীনের কয়েক দিন আগে জিপটি নদীতে ফেলে দেয়া হয়। শান্তি কমিটি আরেকটি অফিস করেছিল হামিদ রোডের বিশ্বাস কমিটির অফিস দখল করে।' (পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা, পৃ. ৬৩-৬৪)

পাবনায় পাকিস্তানি আর্মিদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন ছাত্র ইউনিয়নের চীনপন্থি গ্রুপটি। সারা দেশে চীনপন্থি কমিউনিস্টরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিলেও পাবনা জেলায় তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এডওয়ার্ড কলেজে ছাত্রলীগের সঙ্গে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বের জের ধরে তারা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। সাহাবুদ্দিন চুপ্পু এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন: 'টিপু বিশ্বাসের লোকজনদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ ছাত্রলীগের আদর্শিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি এডওয়ার্ড কলেজে আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হতো। ওরা ৭১-এর মার্চ মাসের দিকে ছাত্রলীগ নেতা আব্দুস সাত্তার লালু ভাইকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আমরা তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টায় এডওয়ার্ড কলেজের দিকে ধাবিত হই। এ সময় নুর মিয়ার বাসা থেকে মাসুদ গুলি করে। এতে কেষ্টপুরের শুকুর নিহত হয়। এভাবে ওদের সঙ্গে আমাদের সংঘাত চলতে থাকে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের কয়েকদিন পর ওরা আমাদের জনপ্রিয় আওয়ামীগ নেতা ও তরুণ এমপিএ জনাব আহমেদ রফিককে হত্যা করে। ...বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর পাবনায় ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব-লড়াই শুরু হয়। ছাত্রলীগ, পাকিস্তানি পুলিশ ও চীনপন্থি ছাত্র ইউনিয়ন। সারাদেশের চীনপন্থিরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিলেও পাবনা জেলায় ছাত্রলীগের সঙ্গে দীর্ঘ দ্বন্দ্বের কারণে ওরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ওদের প্রধান নেতা ছিলেন টিপু বিশ্বাস।' (৯ জানুয়ারি, ২০১৫; দৈনিক জোড়বাংলা)

জহুরুল ইসলাম বিশু লিখেছেন: 'পাকিস্তানি আর্মির সরাসরি তত্ত্বাবধানে পাবনায় মাওবাদীদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বিশাল স্বাধীনতাবিরোধী নকশাল বাহিনী গঠন করা হয়। আর্মিরা এদের নাম দিয়েছিল বড় রাজাকার। নকশালদের প্রধান ঘাঁটি ছিল এডওয়ার্ড কলেজ ও পাবনা আলিয়া মাদ্রাসায়। ...তাদের আরেকটি প্রধান ঘাঁটি ছিল সানিকদিয়ার চর এলাকায়। মাওবাদীরা ছিল রাজনীতিসচেতন, আগে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ...হানাদারবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীরা যোগ দেওয়ায় পাবনায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪)

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নকশালরা কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং কী ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে ড. আবু সাইয়িদ 'যমুনার জল ছুঁয়ে যাওয়া এই জনপদ: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক লেখায় উল্লেখ করেছেন: 'ষাট দশকে পাবনা জেলা সদরে ও থানায় প্রকাশ্যে চীনা বিপ্লবের 'লাল বই' পাওয়া যেত। বেড়া, কাশিনাথপুর, সাঁথিয়া, আতাইকুলা, সোনাতলা, সুজানগর, বেড়ার কাজিপুর প্রভৃতি এলাকায় বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাও সেতুং-এর বাণী সংবলিত ছোট ছোট বই প্রচারিত হতো। চীনের আদলে তখন পশ্চিম বাংলায় নকশাল আন্দোলন চলছিল। পূর্ববঙ্গে তার ঢেউ প্রকাশ্যে ধাক্কা দেয়। পাবনা সদরে চর অঞ্চলে টিপু বিশ্বাস ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য বিভিন্ন সেল গঠন করে। নকশালবাড়ির অনুকরণে এদের আদর্শ ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো বলে এদেরকে নকশাল বলা হতো। শ্রেণিশত্রু খতমের নামে তারা গ্রাম অঞ্চলে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত কৃষকদের হত্যা করার মাধ্যমে তাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয়ার কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ করে। এমনকি হাট-বাজারেও তারা অনেক সময় অর্থের জন্য অথবা তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণিশত্রুটিকে হত্যা করে জয় সর্বহারার শ্লোগান দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ডের জানান দিত। বেড়া এলাকায় কৈটোলা, হরিরামপুর এবং নতুন ভারেঙ্গা এলাকায় তাদের ঘাঁটি গড়ে তোলে। '৭০ সনের

মার্চ মাসে ছয়-দফা প্রচারের সময় নানা জায়গায় তারা বাধা প্রদান করে। এমনকি এপ্রিলের প্রথম দিকে নাকালিয়ার জনসভায় জনাব আব্দুল মতিন (ভাষা মতিন), মির্জা আব্দুল আউয়াল, মির্জা আব্দুল হালিম, মির্জা আব্দুল জলিল এবং নতুন ভারাঙ্গার ফরমান আলীর নেতৃত্বে নাকালিয়া বাজারে অনুষ্ঠিত জনসভায় লাল টুপি মাথায় দিয়ে সশস্ত্র হামলা করে। কিন্তু নাকালিয়ার ছাত্র-যুবক বিশেষ করে আব্দুল করিমের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী ভলেন্টিয়ার বাহিনী তাদের সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিহত করে তাড়িয়ে দেয়। এদের শ্লোগান ছিল 'ভোটের আগে ভাত চাই'। এরা বিভিন্ন গেরিলা ইউনিট গঠন করে নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে এমনভাবে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় আওয়ামী লীগ সংগঠন আমার নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয়, যার ফলে তারা এলাকা ছেড়ে যমুনার শৈলজানা চরে জনাব আব্দুল মতিনের গ্রামে আশ্রয় নেয়। যাওয়ার সময় তাদের শ্লোগান ছিল এবং বিভিন্ন দেয়ালে লিখেছিল 'শালারা কর নির্বাচন, আমরা গেলাম সুন্দরবন'। প্রকৃত অর্থে তারা সুন্দরবন না গিয়ে চর অঞ্চলে ঘাঁটি গড়ে তোলে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধার নিকট থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদেরকে খতম করে দেয়। নতুন ভারেঙ্গা এলাকায় নকশালের শক্তিশালী নেতা ফরমান আলী খতমের রাজনীতি শুরু করে। আমাদের জনসভা বানচাল করার জন্য হুমকি প্রদান করলে লাঠি, সরকি, বল্লম ইত্যাদি জনসভার স্থলে খড়ের পালা তুলে তার নীচে রেখে দেয়া হয়। ... অন্যদিকে ধুলাউরির আলোকদিয়া গ্রামের খোকন, রশিদ, আল্লেক, আজিম, তোরাব, সোনাই, আমিন প্রমুখ দিনের বেলা আমাদের সঙ্গে থাকলেও রাতে বিভিন্ন গ্রামে নকশালের সেল গড়ে তোলে। এরা টিপু বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।'

পাকিস্তানি আর্মিরা পাবনায় আরো একটি ভয়ঙ্কর বাহিনী তৈরি করেছিল বিহারিদের নিয়ে। পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রচুর বিহারী বসবাস করতো। তারা আর্মিদের সঙ্গে মিশে ব্যাপকভাবে বাঙালি হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাবনা শহরের কিছু কসাই এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলখানা থেকে নিয়ে আসা দুর্ধর্ষ আসামীরা। বিহারিরাও রাজাকারদের মতো পাকিস্তানি আর্মিদের সহযোগিতা করে, মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের লোকদের ঘরবাড়ি চিনিয়ে দিতো, হত্যা, লুটপাট ও ধ্বংসকাণ্ডে সহযোগিতা করতো।

জহুরুল ইসলাম বিশু লিখেছেন: 'পাবনায় আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিল আবদুল মতিন ঘেটু। তার আস্তানা ছিল শালগাড়িয়ায়। ... ঘেটু শালগাড়িয়ায় তার নিজের বাড়িতে মানুষজন ধরে এনে হত্যার কসাইখানা খুলেছিল। আলবদর বাহিনী গঠিত হতো ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট একেকটি গ্রুপে। পাবনার বহু লোক রাজাকার, আলশামস ও আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তাদের ট্রেনিং হতো ডিগ্রি কলেজের পেছনের মাঠে আমবাগানে। ...ঘাতক দালাল রাজাকার ও নকশালরা পাকিস্তানি আর্মিদের সবসময় কুপরামর্শ দিত। আওয়ামী লীগের লোকজনদের চিনিয়ে দিত, মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটির খবর এনে দিত। রাজাকার আর নকশালরা না থাকলে আর্মিরা পাবনার মানুষের উপর এতো অত্যাচার করতে পারতো না। দালালরা আর্মিদের বুঝিয়েছিল, বাংলার মানুষসহ সবকিছু গনিমতের মাল, যা খুশি তাই করো। সন্ধ্যার পর তারা শহরে লুটপাট করতো সবাই একসঙ্গে।' (পৃ. ৬৫)

১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর সদস্যরা পাবনা জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষদের ধরে নিয়ে ওয়াপদার টর্চার সেলে অত্যাচার করে নির্মমভাবে হত্যা করতো। ওয়াপদা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতার বর্ণনা পাওয়া যায় জহুরুল ইসলাম বিশুর 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা' গ্রন্থে: 'সেখানে অমানুষিক অত্যাচার করত রাতের পর রাত। আধমরা অবস্থায় নিয়ে যেত বালিয়া হালট গোরস্থানে। গোরস্থানের মধ্যেই তাদের গুলি করে হত্যা করে ফেলে রেখে যেতো। বালিয়া হালট ঈদগাহ মাঠে নিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করা হতো। মোজাহার আলীর রাইস মিলের পুকুরের পাড়ে ডাবগাছের সঙ্গে বেঁধে বহু লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। লাশগুলো গাছের সঙ্গেই বাঁধা অবস্থায় রেখে যেতো ওইসব নরপিশাচ। লাশ পচে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো। বেশিরভাগ লাশ শিয়াল, কুকুর, শকুন খেয়ে যেতো। কোনো কোনো সময় জীবনের ঝুঁকি নয়ে এলাকার মানুষজন গোপনে দু-একটি লাশ মাটিচাপা দিতো। প্রতিরাতেই পাকিস্তানি আর্মি এসব এলাকার এনে হত্যা করতো বহু মানুষকে। রাতে যখন গুলি করে হত্যা করতো তখন মানুষের করুণ আর্তনাদ, কাকুতি-মিনতি আর চিৎকারে ওই এলাকার বাতাস ভারি হয়ে উঠতো। সে এক হৃদয়বিদারক অবস্থা। বালিয়াহালট এলাকা একটি নরকে পরিণত করেছিল বর্বর হানাদার বাহিনী। বিসিক এলাকার পেছনের মাঠেও মাঝে মধ্যে বহু লাশ নিয়ে মাটির নিয়ে পুঁতে রাখতো আর্মিরা।' (পৃ. ৭৬-৭৭) । এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, পাবনার বিভিন্ন অঞ্চলে পাকবাহিনীর লোকেরা কী রকম নির্মমতা চালিয়েছে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদরদের দ্বারা সংঘটিত পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানের হত্যাযজ্ঞ ও নির্মমতার কিছু পরিচয়-

২৬ মার্চ, ১৯৭১: পাকসেনারা পাবনা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে অ্যাডভোকেট আমিনুদ্দিন এমপিএ, সাঈদ তালুকদার, ডা. অমলেন্দু দাক্ষীসহ অনেককে গ্রেফতার করে ও নির্বিচারে গুলি চালায় গণমানুষের ওপর। বেলা ৪টায় পাবনা পৌরসভার কৃষ্ণপুর গ্রামের কিছু সংখ্যক মুসুল্লি কার্ফু ভঙ্গ করে শুকুরের নামাজে জানাজা পড়ছিলেন। এ-সময় পাকসেনারা জানাজা নামাজের ওপর গুলিবর্ষণ করে।

২৭ মার্চ, ১৯৭১: পাকসেনাদের নৃশংস অত্যাচার ও গুলিতে শহিদ হন অ্যাডভোকেট আমিনুদ্দিন এমপিএ, সাঈদ তালুকদার, ডা. অমলেন্দু দাক্ষীসহ কয়েকজন। এদিন অধ্যাপক আবু সাইয়িদের চিঠির প্রেক্ষিতে সাঁথিয়া থানার ওসি সাঁথিয়ার প্রায় ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ১টি করে অস্ত্র প্রদান করে। এদিন মুক্তিকামী জনতা ঈশ্বরদী বিমান বন্দর ঘেরাও করে এবং সেখানে অবস্থানরত পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

৯ এপ্রিল, ১৯৭১: নগরবাড়ি ঘাটে পাক আর্মিরা দু-বার এয়ার রেইড করে। প্লেন থেকে ব্যাপক ব্রাশ ফায়ার চালায়।

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ : পাকসেনারা চতুর্মুখী আক্রমণে নগরবাড়ি ঘাট দখল করে এবং দ্রুত পাবনা শহরে প্রবেশ করে। পাকসেনারা পাবনা শহরে প্রবেশের সময় রাস্তার দু-পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট ও প্রতিষ্ঠানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গুলি করে অগণিত মানুষকে হত্যা করে। পাক-হানাদার বাহিনী পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা সার্কিট হাউজ ও নূরপুর ডাকবাংলাতে ঘাঁটি স্থাপন করে। পাবনা প্রবেশ করেই তারা চালাতে থাকে অকথ্য অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, নারী ধর্ষণ ও লুট-পাট।

১১ এপ্রিল, ১৯৭১: পাকসেনারা পাবনা শহরের রক্ষাকালী মন্দিরের সামনে গণহত্যা চালায়। ২০-২৫ জন সাধারণ মানুষ শহিদ হন। এদিন পাকসেনারা হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এছাড়া পাকসেনারা ঈশ্বরদী শহর দখল করে, পাবনা থেকে ঈশ্বরদীর দিকে যাওয়ার পথে তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। পাকবাহিনী পাবনা শহর ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

১২ এপ্রিল, ১৯৭১–ঈশ্বরদী বাজার ও পাকশী রেলকলোনি গণহত্যা: এতে তাদের সহযোগিতা করে পাকশীতে বসবাসরত বিহারিরা। ঐদিন শহিদ হন রেল কর্মচারী ইয়াকুব আলী, আব্দুল লতিফ ও তার দুই ভাই। আরও শহিদ হন পাকশী হাসপাতালের আরএস সাহেবের পরিবারের সকল সদস্য ও যুক্তিতলার ব্যবসায়ী জয়েন উদ্দিনসহ কয়েকজন। হাসেম আলী মিলনায়তনের পিয়ন আব্দুল মালেক তার বাসার ছাদে বসে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখেছিলেন। অবস্থা এতই ভয়াবহ ছিল যে লাশগুলো দাফন করার লোক পর্যন্ত কেউ ছিল না। পরে সুইপার কলোনীর সুইপাররা লাশগুলো পুঁতে রাখে। পাকসেনারা ঐদিন বাজারের দোকানগুলোতে ব্যাপক লুট-পাট চালায়। অনেকে মসজিদে আশ্রয় নিয়েও রেহাই পায়নি। আবুল কালাম আজাদ জানিয়েছেন–'এই মসজিদেই আব্দুল মোত্তালেব খান, রফিক পাটোয়ারী, মোয়াজ্জেম হোসেন ও হেলালসহ আরো অনেককে পাকসেনা ও তাদের দোসররা সেদিন হত্যা করেছিল।' (মুক্তিযুদ্ধে পাবনা জেলা কিছু কথা, পৃ. ৩৩) কামাল আহমেদ লিখেছেন: '১২ এপ্রিল তারিখে বিহারিরা শুধু যে বাঙালিদের দোকান ও বাড়ি লুট এবং বাড়িতে অথবা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েই বাঙালিদের হত্যা করেছিল তা নয়, ইসলাম ও পাকিস্তানের এসব স্বঘোষিত রক্ষকেরা প্রাণভয়ে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী অনেক বাঙালিকেও মসজিদ থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনে মসজিদের সামনে বা পাশেই নির্মমভাবে হত্যা করে। এ রকম বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে ঈশ্বরদী জামে মসজিদেই।'

১৩ এপ্রিল, ১৯৭১: পাকবাহিনী সর্বপ্রথম পাবনা শহরের বাইরে গ্রাম পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং গণহত্যা চালায় আতাইকুলা ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া, শাঁখারীপাড়া ও সারদিয়া গ্রামে। সকাল ৯টা থেকে শুরু করে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে তাদের এ হত্যাযজ্ঞ। হিন্দুপ্রধান এই এলাকার মন্দির, বিগ্রহ এবং অনেক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় তারা। 'পাকিস্তানি আর্মির গুলিতে সেতিন শহীদ হয়েছিলেন: ১. স্বপন কুমার সাহা চৌধুরী, শাখারীপাড়া; ২. গোপালকুমার সাহা চৌধুরী, শাখারীপাড়া; ৩. দ্বিজেন্দ্রনাথ সাহা, শাখারীপাড়া; ৪. হরেন্দ্রনাথ সাহা, শালগাড়িয়া; ৫. অশোক কুমার সাহা চৌধুরী, শাখারীপাড়া; ৬. কালীপদ বাগচী, শাখারীপাড়া; ৭. মনি গোপাল সাহা, কুচিয়ামোরা; ৮. ফণী গোপাল সাহা, কুচিয়ামোরা; ৯. সুষেণ কুমার সাহা, কুচিয়ামোরা; ১০. রবীন্দ্রনাথ রায়, কুচিয়ামোরা; ১১. মাখনলাল পাল, সারদিয়ার।

২৩ এপ্রিল ১৯৭১–বাঘাইল গণহত্যা: ঈশ্বরদী থানার বাঘাইলে পাকসেনারা গণহত্যা চালায়। এ সম্পর্কে আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন–'২৩ এপ্রিল পাকবাহিনী অবাঙালিদের সহায়তায় পাকশীর পূর্ব পার্শ্বস্থ গ্রাম বাঘাইলে হানা দেয় ঠিক

দুপুরবেলা। সবে মাঠের কাজ শেষ করে পুরুষরা ফিরেছে ঘরে। বউ-ঝি'রা দুপুরের রান্না-বাড়ায় ব্যস্ত। এ সময়ই হানা দেয় মৃত্যুদূত। পাকশীর কলোনি সংলগ্ন হচ্ছে বাঘাইল পশ্চিম পাড়া। পাক বর্বররা এই পাড়ায় ঢুকে একে একে ধরে আনে মেয়ে-পুরুষ-শিশুকে– সামনে যাকে পায় তাকেই। তারপর কলমা পড়িয়ে, সেইসাথে উলঙ্গ করে পরীক্ষা করে তারা মুসলমান কি না। এতেও সন্তুষ্ট হতে পারে না তারা। মনে চেপে ছিল তাদের খুনের নেশা। তাই একে একে লাইন করে দাঁড় করানো হয় ভীত-সন্ত্রস্ত ধৃত লোকজনকে। তারপর একঝাঁক গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে ৫০ জন নারী-পুরুষ। পাকবাহিনীর এই হত্যাকাণ্ডে সেদিন যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন–মোসলেম, মজিবর, আরমান, জ্যোৎস্না, রূপজান, জাহানারাসহ আরও অনেকে।' (মুক্তিযুদ্ধে পাবনা জেলা কিছু কথা, পৃ.৩৪)

২৪ এপ্রিল: এদিন পাকিস্তানি আর্মিরা এক নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায় পাবনা শহরের জুবিলি ট্যাঙ্ক পাড়ায়। তারা প্রায় ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ তোজাম্মেল হোসেনের বাড়িতে ঢুকে গুলি করে হত্যা করে তাঁর লাশ পুড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে তোজাম্মেল হোসেনের বড় জামাতা মোখলেসুর রহমানকেও হত্যা করে পাকিস্তানি নরপশুরা।।

২৫ এপ্রিল, ১৯৭১–লক্ষ্মীকুণ্ডা গণহত্যা: মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী পাবনা জেলার যে-সকল স্থানে গণহত্যা চালিয়েছিল তার মধ্যে ঈশ্বরদী উপজেলার লক্ষ্মীকণ্ডা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর হত্যাকাণ্ড ছিল উল্লেখযোগ্য ও হৃদয় বিদারক। ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল এই হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। জানা যায়–'এদিন সুপরিকল্পিতভাবে ছ'খানা গ্রামে চালানো হয় এই হত্যাযজ্ঞ। আনুমানিক সকাল দশটার দিকে পাকশী কাগজকল ক্যাম্প থেকে পাকসেনা ও অবাঙালিদের দু'টি দলের একটি ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক ধরে অগ্রসর হয় সাহাপুরের দিকে। আর একটি দল রূপপুরের মাঝ দিয়ে পাকুড়িয়া হয়ে সাহাপুরের দিকে। পাকবাহিনীর নারকীয় তাণ্ডবে এসব গ্রামের মানুষ প্রাণভয়ে বাবুলচারা দিঘা, কামালপুর, চরকুড়ালিয়ার দিকে ছুটতে থাকে। যেসব নারী-শিশু-বৃদ্ধ পালাতে পারল না তারা পাক পিশাচদের নরমেধ যজ্ঞের শিকার হ'ল।...সমস্ত দিন ধরে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব চালিয়ে পাকবাহিনী বিকেলের দিকে পাকশী ফিরে যায়। ঔদিন রূপপুর গ্রামের আসগর ও অশীতিপর বৃদ্ধসহ ১৩ জন নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয়। দাদাপুরের হাটের ওপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন নর-নারীকে পাক-পশুরা হত্যা করে। লক্ষ্মীকুণ্ডা গ্রামের মুচিদের সমস্ত পাড়াটিই ভস্মীভূত করা হয়। আর সেই সাথে কাফের নিধনের পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে দরিদ্র মুচিদেরও হত্যা করা হয়। পাকুরিয়ার বৃদ্ধ স্কুলমাস্টার উম্মেদ আলী মৌলবীসহ দশ-বারোজন নিরীহ গ্রামবাসীও পাক পশুদের হাতে হলেন নিহত। সাহাপুরের গ্যাদা মিস্ত্রি, আরশেদ, মহাদেবপুরের বদি খোনকার ও তার ছেলেসহ বহু নাম-না-জানা মানুষের লাশে সেদিন ছেয়ে গিয়েছিল ঐ অঞ্চরটি। জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল প্রায় শতাধিক ঘরবাড়ি। ঐ দিন পাক বর্বরতার শিকার হয়েছিলেন প্রায় দুই শতেরও অধিক নর-নারী।' ('মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা পাবনা জেলা', আবুল কালাম আজাদ, পৃ. ৩৫)

২৮ এপ্রিল, ১৯৭১: সকালে পাবনা শহরের তাড়াশ বিল্ডিং-এর পাশের রাস্তা থেকে আর্মিরা কোপন কারিগর ও রিয়াজ শেখকে আটক করে। এ সময় হিন্দু একটি ছেলেকে সুরা বলতে বলে এবং কাপড় খুলে দেখে তারা হিন্দু না মুসলমান। এখানে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। গুলিবিদ্ধ একজন বেঁচে যায়।

৩ মে, ১৯৭১: পাকবাহিনী সর্বপ্রথম সুজানগর থানায় প্রবেশ করে ৩ মে তারিখে। তারা সুজানগরের বসন্ত কুমার পাল, লক্ষী কুণ্ডু ও সুরেশ চন্দ্র কুণ্ডুকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

৫ মে, ১৯৭১: পাকসেনারা সাঁথিয়ার বড়গ্রাম গ্রামের শ্রী অজিত কুমারের স্ত্রী শ্রীমতি নিশুরাণীর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়।

৬ মে, ১৯৭১: পাকিস্তানি আর্মিরা শহরের একটি বাসা থেকে গ্রেফতার করে পাবনার তৎকালীন ডিআইও-১ মির্জা হাবিবুর রহমান বেগ ও জেলা আনসার অ্যাডজুটেন্ট আবদুল বরকতকে। পরে তাঁদের বালিহালটের কাছে তালগাছে বেঁধে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

৭ মে, ১৯৭১: পাকসেনারা পুলিশ লাইন থেকে ৪০ জন পুলিশ সদস্যকে ধরে ওয়াপদা টর্চার সেলে নির্মম অত্যাচার করে এবং বালিহালট গোরস্থানের পাশে নিয়ে বেয়নেট চার্জ এবং গুলি করে হত্যা করে।

৮ মে, ১৯৭১: শহরের পার্শ্ববর্তী সিঙা বাজারের পালপাড়ায় পাকসেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে নিরীহ মানুষদের। তারা পালপাড়ার বিভিন্ন বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তারা ঐদিন ধর্ষণ করে পালপাড়ার যুবতী মেয়েদের।

১২ মে, ১৯৭১–সাতবাড়িয়া গণহত্যা: পাবনার সুজানগর উপজেলার সাতবাড়িয়া গণহত্যা পাকিস্তানি সেনাদের নির্মমতার এক বীভৎস ইতিহাস হয়ে আছে। স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় ১৯৭১ সালের ১২ মে পাকিস্তানি সেনারা

১৮/২০টি ট্রাকে ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢুকে পরে সাতবাড়িয়া গ্রামে। ঐ গ্রামে ঢুকেই তারা অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও গণহত্যা শুরু করে। ভোর থেকে প্রায় ১০ ঘণ্টা চলে এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ। কেবল সাতবাড়িয়াই নয়; পার্শ্ববর্তী তাড়াবাড়িয়া, ফরিদপুর, নারুহাটি ও কন্দর্পপুর গ্রামেও চলে এই বর্বরতা। সাতবাড়িয়া গণহত্যা সম্পর্কে রনেশ মৈত্র লিখেছেন: 'এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞে গোটা তলাট জুড়ে ৭০০/৮০০ নিরীহ গ্রামবাসী নারী-পুরুষ শহীদ হন। গ্রামগুলি দাউদাউ করে পুড়তে থাকে। অনেকের লাশ পদ্মায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অনেককে কয়েকটি গণকবরে সমাধিস্থ করা হয়।' (মুক্তিযুদ্ধে পাবনা জেলা) সাতবাড়িয়া গণহত্যার শহীদদের স্মরণে নির্মাণ করা হয়েছে সুবৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ।

১৪ মে, ১৯৭১–ডেমরা গণহত্যা: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর পাকবাহিনী ক্রমে ঢাকা শহর থেকে বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীগুলোতে ঢুকে পড়ে এবং হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চালায়। এতে অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়। এরকম বর্বর ঘটনা ঘটেছিল পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলার ডেমরা গ্রামে। ২০০৪ সলের ১৪ মে পাবনার 'দৈনিক নির্ভর' পত্রিকায় প্রকাশিত আব্দুদ দাইয়েনের 'ডেমরা গণহত্যার ট্রাজেডি' শীর্ষক লেখা থেকে জানা যায়–"দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ১৪ মে (বাংলা ১৩৭৮ সালের ৩ বৈশাখ) শুক্রবার। গ্রামবাসী যখন ফজরের নামাজ ও প্রাতঃকালীন পূজার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই মোয়াজ্জিনের আযানের সুরেলা মধুর আওয়াজকে ম্লান করে দিয়ে ঘুমন্ত গ্রামবাসী হিন্দু-মুসলমানকে জাগিয়ে তোলে হানাদার বাহিনীর রাইফেল, মর্টার, মেশিন গানের বিকট আওয়াজ। ঘুমভাঙা ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক-ওদিক পালাতে গিয়ে দেখে পালানোর সর রাস্তা বন্ধ। সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলেছে পাকবাহিনী, ডেমরা ছিল একটি হিন্দুপ্রধান গ্রাম। পাকবাহিনী ও তার দোসর রাজাকার-আলবদরদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইতোমধ্যে পাবনার বেড়া, শাহজাদপুর, কাশীনাথপুর, উল্লাপাড়া, কুচিয়ামোরা এবং অন্যান্য শহর থেকে অনেক পরিবার হিন্দু প্রধান এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল।...বেড়ার জোড়দহ গ্রামের জনৈক আসাদ দালাল প্রচুর সোনাদানা, সুন্দরী যুবতী ও বিশেষ করে মালায়ুন হত্যার কথা বলে পাকসেনাদের ডেমরা গ্রামে নিয়ে এসেছিল বলে এই এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে। ডেমরা হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী সন্তোষ কুণ্ডু (শংকর মাস্টার) (৬০), জগদীশ কুণ্ডু (৬২), বেণু রায় (৫৫), রনজিৎ (৫৬), রত্না পাটনী মৃত (৫৮) প্রভৃতি ব্যক্তির ভাষ্যে জানা যায়, বাঘাবড়ি ঘাট ও পাবনা থেকে (আতাইকুলা হয়ে) আসা প্রায় ৫শ পাকসেনা সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলে রাতের অন্ধকারে। ভোর থেকে শুরু হয় গণহত্যা।... চারিদিকে শুধু গুলি আর আগুন। পাকসেনারা পাখির মত গুলি করে হত্যা করে নিরীহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। তালিকা অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোক ধরে এনে লাইন ধরিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। বনে-জঙ্গলে, ঘরের ফাঁকে, লতাপাতা, কচুরীপানার ভেতর থেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে এনে পুকুর পাড়, নদীর পাড়, লাইনের ধারে হাত-পা-চোখ বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। হায়েনারা গাছে উঠে লুকিয়ে থাকা লোকদের নিচ থেকে গুলি করে হত্যা করে। একই সঙ্গে চলে ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট।'

ঐ লেখা থেকে আরো জানা যায়, "ঘরের খামের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে আগুন ধরিয়ে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারা হয় গ্রামবাসী ও আশ্রিতদের। চোখের সামনে যুবতী মেয়েদের কাপড় কেড়ে নিয়ে ধর্ষণ করে। সারা গ্রাম জুড়ে ক্ষত-বিক্ষত লাশ, আহত মানুষের আহাজারী, ধর্ষিতা মহিলাদেও কাতরানির শব্দ। এক একটি লাশ একেকভাবে পড়ে আছে। অত্যাচারের মাত্রা এতই বীভৎস ছিল যে নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কে কোথায় আছে খোঁজ নেয়ার মত অবস্থা ছিল না। পশুরা পিতার সামনে কন্যাকে, মা-মেয়েকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে। মঙ্গলা কণ্ডুকে জড়িয়ে ধরে রেখেও তাকে রক্ষা করতে পারেনি তার অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী। শাহজাদপুরের দেবেন্দ্রনাথ পালের কাছ থেকে সোনা লুট করে তাকে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে পাবনার প্রসিদ্ধ গেঞ্জি ব্যবসায়ী মণিন্দ্রনাথকে, এডরুক কোম্পানির সেলসম্যান দিলীপ চক্রবর্তীকে, রাম জগন্নাথ রায়কে। রক্ষা পায়নি সমাজহিতৈষী ঋষিকেষ কুণ্ডু। বিভূতিভূষণ কণ্ডু প্রাণে বাঁচলেও রক্ষা পায়নি বেড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অখিল পাল। রায় জমিদার পরিবারের দু'ভাই মাখন লাল রায় ও বলরাম রায়কে গাছের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। নির্মমভাবে হত্যা করা হয় বিহারীলাল, জীতেন্দ্রনাথ রায়, গোরা রায়, ফটিকচন্দ্র ঘোষ, দাসু রায়, সুধিলাল ঘোষ, জগদীশ কুণ্ডু, জ্যোতিষচন্দ্র কুণ্ডু, নিরেন্দ্রনাথ রায়, অমল পাল, লক্ষ্মণ হালদার ও তার শিশুপুত্র ফটিক হালদার, মোসলেম ফকির, মন্টু শেখ, হারান আলী প্রাং, ফজর আলী প্রাং, মহিম শেখ প্রমুখকে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় স্কুলছাত্র স্বপন কুমার কুণ্ডু, যামিনী, মকছেদ, বরুন ও স্বপন গাঙ্গুলিসহ আরো অনেক ছাত্রকে।

হানাদাররা নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে সম্পদশালী গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করে। ডেমরা গ্রাম ছাড়াও পাকসেনারা ডেমরা রাজার পুড়িয়ে দেয়। পরে ইস্ট বেঙ্গলের বিখ্যাত ও সর্ববৃহৎ এই কালিমন্দিরসহ স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। ঐদিন পাকসেনারা ডেমড়া গ্রামের প্রায় ৯৫ ভাগ ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। পার্শ্ববর্তী বড়াল

নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কয়েকজন যুবতী ইজ্জত বাঁচালেও জীবন রক্ষা করতে পারে নি। দুপুর পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞ চলে। এর মধ্যে খাশী জবাই করে রান্না করা হয়। পাকসেনারা আনন্দ-উল্লাস করে খাওয়া-দাওয়ার পর আরও খাসী নৌকায় করে নিয়ে যায়। সেই সাথে যাবার বেলায় হানাদাররা নীলা ও শীলা নামের সুন্দরী দুই বোনকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়।

পাকবাহিনীর লোকেরা ডেমড়ায় ঐদিন প্রায় এক হাজার মানুষকে হত্যা করে। পাকসেনাদের চলে যাওয়ার পর এলাকাবাসী পুরানো ডোবা, নালা, গর্তে লাশগুলো মাটিচাপা দেয়। কিছু লাশ গ্রামের পার্শ্ববর্তী বড়াল নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আশপাশের গ্রামের লোকেরা ডেমড়ার হত্যাযজ্ঞে শহীদদের লাশ দেখে হত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। স্বজন হারানো মানুষদের আর্তনাদে ডেমড়ার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে যায়। এলাকাবাসীর মতে, ৭১ সালে পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে সৃষ্ট ডেমরা গণহত্যার ট্রাজেডি চেঙ্গিস খাঁ হালাকু খানের নির্মমতাকে হার মানায়।"

ডেমরা গণহত্যার শহিদদের স্মরণে ২০১০ সালে নির্মাণ করা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ। উল্লেখ্য যে আসাদ দালাল পাকবাহিনীর সদস্যদের খবর দিয়ে এনেছিলো এই গণহত্যার জন্য তার পরিণতিও শুভ হয়নি। সাংবাদিক হাবিবুর রহমান স্বপন 'কলাম সংগ্রহ' বইয়ের ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–'ডেমড়ার গণহত্যার জন্য যাকে দায়ী করা হয়; যার তথ্যের ভিত্তিতে পাকবাহিনী ডেমড়ায় প্রবেশ করে, সেই আসাদ দালালকে বেড়া থেকে মহান স্বাধীনতার পর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা ধরে ডেমড়ার সেই গণকবর স্থলে নিয়ে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাকে গণকবরের কাছে হত্যা করা হবে। মুক্তিযোদ্ধারা আসাদকে নিয়ে যাওয়ার পথিমধ্যে বেড়ার অদূরে বড়াল নদীর ধারে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী আসাদকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। পরে আসাদকে জনতা গণপিটুনী দিয়ে হাতে পায়ে লোহার পেরেক ঢুকিয়ে হত্যা করে।'

১৭ মে, ১৯৭১: পাকসেনারা সাঁথিয়া থানা রূপসী গ্রামে গণহত্যা চালায়।

২৪ মে, ১৯৭১–হাদল ও কালিকাপুর গণহত্যা: পাকবাহিনী নিষ্ঠুর রূপে হাজির হয় ফরিদপুর থানার হাদল ইউনিয়নের হাদল ও কালিকাপুর গ্রামে। স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় তারা এখানে উপস্থিত হয়। হাদল ছিল একটি হিন্দুপ্রধান গ্রাম। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় পাবনা শহর, আটঘরিয়া, চাটমোহর, ঈশ্বরদী এবং আশপাশের অনেক স্থান থেকে লোকজন এসে এই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পাকসেনারা এখানে এসেও ব্যাপক গণহত্যা চালায়। লুণ্ঠন, ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ করে তারা এলাকাটিতে ভয়বহ অবস্থা সৃষ্টি করে। হাদল, কালিকাপুর এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ৩০০ মানুষকে এখানে হত্যা করা হয়। এঁদের মধ্যে যাঁদের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরা হলেন ১. আর এম একাডেমির শিক্ষক প্রাণকৃষ্ণ সাহা; ২. অশোক রায়; ৩. কালীপদ সাহা, দাশুড়িয়া; ৪. এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র সুব্রত সাহা; ৫. নাট্যশিল্পী পরেশ সাহার শিশুপুত্র; ৬. গোবিন্দ সাহা; ৭. গোবিন্দ সাহার পুত্র; ৮. অনিল বসাক, পাবনা; ৯. ব্যবসায়ী রাখাল বসাক, পাবনা; ১০. নিত্যানন্দ সাহা, হাদল; ১১. বটকৃষ্ণ সাহা, হাদল; ১২. বিনয় কুমার সাহা, হাদল; ১৩. কানাই হলদার, কালিকাপুর; ১৪. সুবোধ সাহা, কালিকাপুর; ১৭. উপেন সাহা কালিকাপুর; ১৮. বনমালী হলদার, কালিকাপুর; ১৯. বুট হলদার, কালিকাপুর; ২০. অমরেশ হলদার, কালিকাপুর; ২১. শশী বালা, কালিকাপুর; ২২. রবি হলদারের মা, কালিকাপুর; ২৩. গোবিন্দ সাহা, কালিকাপুর; ২৪. বীলারাণী, কালিকাপুর; ২৫. মহামায়া সাহা, কালিকাপুর; ২৬. অমূল্য সরকার, কালিকাপুর; ২৭. সীতানাথ সাহা, কালিকাপুর; ২৮. ভোলানাথ সাহা, কালিকাপুর; ২৯. অনিল বসাক, পাবনা; ৩০. নিমাই সরকার, হাদল; ৩১. জয়দেব নরসুন্দর, হাদল; ৩২. বিষ্ণু সাহা, হাদল; ৩৩. কানা বাদলা, হাদল; ৩৪. হারান হালদার, হাদল; ৩৫. পরেশ সাহা, হাদল; ৩৬. প্রিয় হালদার, হাদল; ৩৭. রাধু সাহা, হাদল; ৩৮. মধুসূদন সাহা, হাদল; ৩৯. সুবলচন্দ্র সাহা, হাদল; ৪০. বাদল সাহা, হাদল; ৪১. শ্রীপদ সাহা, হাদল; ৪২. প্রসেনজিৎ সাহার স্ত্রী; ৪৩. এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র সুবল সাহা প্রমুখ।

১০ জুন, ১৯৭১: পাবনা জেলা স্কুলের হেড মওলানা কসিমউদ্দিনকে পাবনা ময়লাগাড়ির নিকটস্থ চেক পোস্টে বাস থেকে নামিয়ে পরে সাঁথিয়া থানার মাধপুরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

১৬ জুলাই, ১৯৭১: এডওয়ার্ড কলেজের দুই ছাত্র শহীদুল ইসলাম মানিক ও শিলুকে পৈলানপুর থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে পাকবাহিনী।

২৬ জুলাই, ১৯৭১: পাবনা শহরের গোবিন্দার বাসা থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয় জনপ্রিয় শিক্ষক শিরু মাস্টারকে। তিনি ছিলেন এ আর শামসুল ইসলামের ভাই।

১৪ আগস্ট, ১৯৭১: এফএফ ট্রেনিংপ্রাপ্ত সুবোধকুমার দে টেংকু আতাইকুলার কাছাড়পুরে পাকসেনাদের গুলিতে শহিদ হন।

২০ আগস্ট, ১৯৭১–লক্ষ্মীপুর গণহত্যা: আতাইকুলা থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট পাকসেনারা নির্মম গণহত্যা চালায়। আবুল কালাম আজাদের 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা পাবনা জেলা' বই থেকে জানা যায়: 'আনুমানিক বেলা সাড়ে বারোটার সময় পাকবাহিনী লক্ষ্মীপুরে হামলা চালিয়ে স্কুল শিক্ষক নিরঞ্জন পাল, তার দুই ভাই কমল পাল ও কুশল পাল এবং অমর ভদ্র ও ধীরেন সরসহ ২৬ জন হিন্দু ও দুজন মুসলমানকে লক্ষ্মীপুর কালীবাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। কালীমন্দিরের বিগ্রহের সামনে তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।' (পৃ.৪২) এরপর পাকসেনারা হানা দেয় পার্শ্ববর্তী কৈজুরী শ্রীপুর গ্রামে। গ্রামবাসী তো ভয়ে আগেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। তখন পাকপশুরা যায় বরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী ও আওয়ামী লীগ নেতা এম এ গফুরের বাড়িতে। তাঁকে ধরে বাড়ির সামনে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস এম এ গফুর যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন রাজশাহী বেতারে আব্দুল গফুরের কণ্ঠের গান বাজছিল।

২১ আগস্ট, ১৯৭১–গোপালনগর গণহত্য: ফরিদপুর উপজেলার বনওয়ারীনগর ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের মানুষের জীবনে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি নেমে এসেছেল। আগের দিন অর্থাৎ ২০ আগস্ট শুক্রবার পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা গোপালনগর গ্রাম ঘিরে ফেলে। তারপর নিরীহ মানুষদের ধরে এনে কালীবাড়ির আটচালায় জড়ো করে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। এ সময় শহিদ হন–ধীরেন সরকার, এনতাজ সরকার, কাসেম মোল্লা, ভৈরব কর্মকার প্রমুখ। বেলা ১১টার দিকে ধরে আনা লোকজনকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঐদিন পাকসেনারা অগ্নিসংযোগ করে বনওয়ারিনগর হাট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার অনেক ঘর-বাড়িতে। পাকসেনাদের চলে যাওয়ার পর লাশের স্তূপের ভেতর থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পচা ঘোষ ও অনিল কর্মকারকে। গোপালনগর এই গণহত্যায় যাঁরা শহিদ হন তাঁরা হলেন–১. গোপাল পাল ॥; ২. কাশেম মোল্লা; ৩. অমূল্য সরকার; ৪. এন্তাজ সরকা; ৫. ধীরেন অধিকারী; ৬. ভৈরব কর্মকার; ৭. বাখাল ঘোষ; ৮. হরিপদ ঘোষ; ৯. বেষ্ট ঘোষ; ১০. রবীনন্দী; ১১. হরেন হালদার; ১২. মনমোহন হালদার; ১৩. মঙ্গলা হালদার; ১৪. শম্ভু হালদার; ১৫. উমেশ হালদার; ১৬. ফটিক হালদার; ১৭. অধীর পাল; ১৮. সুধীর পাল; ১৯. কালাচাঁদ পাল; ২০. রণজিৎ পাল; ২১. ধিরু মালী; ২২. সুধীর মালী; ২৩. সুধীর কর্মকার; ২৪. সুধীর মালাকার। জানা যায় 'স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম মোল্লাকে কালীমন্দিরের ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে পাকসেনারা।' (রণেশ মৈত্র, মুক্তিযুদ্ধে পাবনা জেলা)

২৪ আগস্ট, ১৯৭১: এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রলীগ নেতা নূরুল ইসলামকে হত্যা করা হয়।

২৫ আগস্ট, ১৯৭১: ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাঁথিয়ার মুক্তিযোদ্ধারা সাঁথিয়ায় প্রবেশ করেন। পাবনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ মনসুর আলী বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১: সারারাত একটি অপারেশন শেষে ক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধা গোলাম সরওয়ার সাধন ও তাঁর সঙ্গীরা সাগরকান্দির এক বাড়িতে অবস্থান নিলে স্থানীয় রাজাকারদের হাতে আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ ধরা পড়েন। পাকসেনারা অতঃপর সাধনকে নগরবাড়ী ঘাটে নিয়ে তার চোখ উপড়ে ফেলে এবং অমানুষিক নির্যাতন করে। ১০ সেপ্টেম্বর তাঁকে হাত-পা বেঁধে যমুনায় ফেলে দেওয়া হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১–নগরবাড়ী ক্যাম্পে বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞ: মুক্তিযুদ্ধের সময় নগরবাড়ী ক্যাম্পে রাজাকার ও পাকসেনারা বহু মানুষকে ধরে নিয়ে তাদের ওপর হায়েনার মতো অত্যাচার চালায়। ১৯৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম, গোলাম সারোয়ার সাধন, ফেরদৌস আলম খান (গেদামনি), স্বপন, সাচ্চু, সাফি, শাহজামান দুলু ও মাশিউর রহমানকে সুজানগরের সাগরকান্দি এলাকা থেকে নগরবাড়ী ক্যাম্পে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এদের মধ্যে সাধন, স্বপন, সাচ্চু ও শফিকে আহত অবস্থায় হাত-পা একসঙ্গে লোহার তার দিয়ে বেঁধে যমুনা নদীতে ফেলে দেয়া হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১: পাকসেনারা দ্বিতীয়বার সাতবাড়িয়া আক্রমণ করে। ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে।

১৪ অক্টোবর, ১৯৭১: মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মতি, আব্দুল মান্নান ও পল্টু মোহন চৌধুরী রাজাকারদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে শহিদ হন। পাবনা সদরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে এই তিনজন শহিদ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

২৪ অক্টোবর, ১৯৭১: পাকসেনারা এ দিন সুজানগরের নিশ্চিন্তপুর, কুড়িপাড়া, সিন্দুরপুর, সিংহনগর, শ্যামনগর, ভাটপাড়া, গুপিনপুর প্রভৃতি গ্রামে অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা ও লুণ্ঠন চালায়। তারা ঐসব গ্রামের অসংখ্য বাড়িঘর পুড়িয়ে

দেয়। শত শত নারী-পুরুষকে হত্যা করে এবং ব্যাপক সম্পদ লুট করে। এদিন মুক্তিযোদ্ধারা নাজিরগঞ্জ ঘাটে পাকিস্তানি বাহিনীর ফেরি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। এতে মিলিশিয়া বাহিনীর ৫০ জন সৈন্য ও ১২ জন রাজাকার নিহত হয়।

২৭ নভেম্বর, ১৯৭১: রাত আনুমানিক ২.৩০ টার দিকে পাকসেনারা অতর্কিতে গুলি চালায় সাঁথিয়ার ধুলাউড়ি গ্রামে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। সানিকদিয়ার চরে ২৭ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা ও নকশালদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ-যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সেলিম শহিদ হন।

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১: মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য পাবনা সদরের নাজিরপুর গ্রামে ৫৮ জনকে একই দিনে পাকবাহিনী গুলি করে হত্যা করে।

৫ ডিসেম্বর ১৯৭১: পাকসেনার আক্রমণে শহিদ হল বেড়ার রমনী মোহন দত্ত (বড় বাবু), গজনবী সরকার, অমূল্য ভৌমিক, আব্দুস সাত্তার, ঘোতা মালি, নিবারণ ঘোষ, মনোরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১: পাকসেনারা সুজানগর বাজারের ব্যবসায়ী মানিকদির গ্রামের অধিবাসী অজিত কণ্ডু, একই গ্রামের আব্দুল হামিদ এবং থানা-সংলগ্ন কালীমন্দিরে অবস্থানকারী কৃষি কর্মচারী গোপালচন্দ্র ভাদুরীকে এক সঙ্গে হত্যা করে মন্দিরের পার্শ্ববর্তী কুয়োর মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যায়।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১: পাবনা জেলার বেড়া থানা থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে দিকপুর গ্রামের একটি রেস্ট হাউজে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকাররা আশ্রয় নেয়। এ খবর পেয়ে বেড়ার মুক্তিযোদ্ধারা রাতের অন্ধকারে রেস্ট হাউজ অবরোধ করেন। শুরু হয় দু'পক্ষের তুমুল লড়াই। এ যুদ্ধে পাকসেনাদের বহুলোক হতাহত হয়। অবশেষে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে রাতের আঁধারে নদীর কূল ধরে পালিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনা জেলাকে পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও নকশালরা নরকে পরিণত করেছিল। এখানকার সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট অনেক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। পাবনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রূপকথা সিনেমা হলের মালিক মোকাররম হোসেন, ছাত্রনন্দিত শিক্ষক শিবাজী মাস্টার, শালগাড়িয়ার সিরাজুল ইসলাম মন্টু, হামিদ ও আফজাল নামের দুই ছাত্র, সাধুপাড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কোবাদ হোসেন (মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান হাবিবের বাবা)সহ হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। দাপুনিয়া ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।

পাবনা শহরে পাকিস্তানি আর্মিদের নির্মমতার বিশদ বিবরণ তুলে ধরে জহুরুল ইসলাম বিশু লিখেছেন: 'পাবনায় স্থায়ীভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। সন্ধ্যার পর দালালদের সঙ্গে নিয়ে আর্মিরা যেসব বাড়িতে যুবতী মেয়ে আছে তাদের বাড়ি থেকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যেতো। দিনের পর দিন ক্যাম্পে আটক রেখে তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করতো। এক সময় হত্যা করতো। মাঝে মাঝে ক্যাম্পে না নিয়ে কোনো মাঠে অথবা কোনো পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন করতো দল বেঁধে। এমনকি বাড়িতে গিয়ে মা-বাবা, স্বামীর সামনেই মা-বোন, স্ত্রীদের ধর্ষণ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করতো না জানোয়ারের দল। পাবনার কত মা-বোনের এরা সর্বনাশ করেছিল তা লিখে শেষ করা যাবে না। নরপশুরা যে কত পৈশাচিক ঘটনা ঘটিয়েছিল তা আজকে কোনো মানুষ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। কত নির্মম কত দুঃখজনক কত ভয়ঙ্কর দানবীয় ঘটনার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল তারা। এসব ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে বহু মানুষ নীরবে চোখের জল ফেলছে আজও। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, এই নরপশুদের এসব পাশবিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতো এবং সঙ্গে গিয়ে বাড়িঘর চিনিয়ে দিত এদেশীয় মীরজাফরের বংশধর ঘাতক দালালরা। তাদের বিবেকে কিছুই বাধত না, উপরন্তু অর্মিরা যখন ধর্ষণ করতো তখন বাইরে বসে এদেশীয় দালালরা হাসাহাসি করতো। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে এদেশের আলোবাতাস আর মাটিতে বড় হয়ে এদেশের মানুষের বিরুদ্ধে এতবড় বেইমানি করতে পারে–এর নজির বিরল।'

পাবনার অন্য ধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ও খ্রিস্টানধর্মের লোকদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতো পাকিস্তানি আর্মিরা। তাদের বোঝানো হয়েছিল, কাফেরদের নিধন করতে তাদের পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। সেজন্য পাকিস্তানি সৈন্যরা অন্যের ধর্মের মানুষদের কাফের মনে করতো। আর্মিদের সহায়তায় রাজাকাররা পাবনার বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছিল। কেবল কালেমা পড়ে মুসলমান হলেই তাদের মুক্তি ছিল না। রীতিমত গরু জবেহ করে আনুষ্ঠানিভাবে তাঁদের খাওয়ানো হতো। জহুরুল ইসলাম বিশু লিখেছেে: 'অষ্টমনিষা, মির্জাপুর, একান্নবিঘা, পরের বাজারে মাঝে মধ্যেই হিন্দুদের গরুর মাংস খাবার অনুষ্ঠান হতো। হিন্দুরা টুপি পরে লাইন ধরে বসে থাকতেন। এক হুজুর মাইকে দোয়া-কালাম পড়তে থাকতো। সুরা মুখস্থ করাতে থাকতো, মুসলমান বানাতে থাকতো। ওদিকে গরুর মাংস রান্নাবান্না হতো। তারপর সবাইকে

পরিবেশন করতো। কে ঠিকমতো খেলো কি খেলো না তা তদারকি করতো রাজাকার, শান্তি কমিটি, আলশামস, আলবদরসহ পাকিস্তানের দালালরা। এভাবে মুসলমান বানানোর পর তাদের ছেড়ে দিতো। তারপর দালালরা তাদের কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখতো। দেশ স্বাধীনের পর সবাই আবার হিন্দুধর্ম পালন করতে থাকেন। আবার কয়েকজন আর হিন্দুধর্মে ফিরে যাননি। যেমন পাবনা শহরের অনন্দ গোপাল চৌবে (বিলু বাবু), পিতামৃত প্রসন্ননাথ চৌবে; মাতা মৃত সরোজিনী চৌবে, মুক্তিযুদ্ধের সময় মুসলমান হয়ে আমিনুল ইসলাম চৌবে নাম রেখেছিলেন, তিনি আর হিন্দুধর্মে ফিরে যাননি। আবার আর এম একাডেমীর সহকারী শিক্ষক নিরঞ্জন সাহা, পিতা স্বর্গীয় নিত্যানন্দ সাহা, জুবিলী ট্যাঙ্ক পাড়া, তিনি দেশ স্বাধীনের পর অবার হিন্দুধর্মেই ফিরে যান। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে মুখে দাড়ি রেখে প্রতিদিন প্রকাশ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়তে হতো। এ ধরনের আরো বহু নজির আছে পাবনায়।'

গুলি করে, পুড়িয়ে এবং গ্রেনেড-বেয়নেট চার্জ করে হত্যার পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাবনায় এসিড দিয়ে পুড়িয়ে নির্মমভাবে মানুষ হত্যা করেছে। পাবনা আলিয়া মাদ্রাসায় স্থাপিত টর্চার সেলে মানুষদের ধরে এনে এভাবে হত্যা করা হতো। এই টর্চার সেলের দায়িত্বে ছিলেন হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন তাহের। নিশু নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায়: 'আর্মিরা মানুষ ধরে এনে হাত-পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে তার শরীরের উপর নাইট্রিক এসিড ঢেলে দেয়। মুহূর্তে গলে যায় একটি মানুষের সারা শরীর। হাত-পা গলে শরীরের সব হাড়গোর বের হয়ে যায়। ...কারো হাত গলে বুকের সঙ্গে লেগে রয়েছে। কারো দু'পা গলে একসঙ্গে জোড়া লেগে রয়েছে। কারো মুখের মাংস গলে চোয়ালের দাঁত বের হয়ে আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য।'

পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদরদের নির্মমতার একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম তাঁর "৭১'র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা" (২০০৬) পুস্তিকায়। সেসব বর্ণনা পড়ে গা শিউরে ওঠে। তাঁর এক সহযোদ্ধাকে কিরকম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: '... আহত মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহানকে পাবনা জেলা রাজাকার কমান্ডার সাত্তার বেয়নেট দিয়ে গলা কেটে নদীর ধারে ফেলে রেখে যায়। পরে দেখা যায় সে বেঁচে আছে। চিকিৎসার পর সে বেঁচে যায়, এখনো সে গলাকাটা শাহজাহান নামে পরিচিত। এরপর আরেক সহযোদ্ধার কথা বলতে গেলে শরীর শিউরে ওঠে, সে হচ্ছে রুদ্রগাতি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদ। পাকসেনারা তাঁকে ধরে নিয়ে সাঁথিয়া থানায় আনে। তারপর সাঁথিয়া থানার সামনে বেল গাছের ডালের সাথে গলায় রশি দিয়ে ঝুলায় এবং রাজাকাররা তাকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। যখন সে মারা যায়, মারা যাবার পর পুরুষাঙ্গ কেটে মুখের ভিতর দিয়ে রাখে।'

এভাবে পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।

গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ

১০ এপ্রিল পাকিস্তানি আর্মি অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নগরবাড়ি ঘাট দিয়ে পাবনায় প্রবেশ করে। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য চলে যান। তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দলে দলে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকেন। বেবী ইসলাম সাক্ষাৎকারে বলেছেন: '১৯৭১ সালের জুন-জুলাই মাসে আমরা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পদ্মায় চার-পাঁচটি নৌকাযোগে ঈশ্বরদী দিয়ে পাবনায় প্রবেশ করি। প্রথমে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক বাধার মুখে পড়ি। এর পর আমরা একটি আখের খেতে অবস্থান নেই। পরে রেকি করে পাবনায় প্রবেশ করি। পাবনায় এসে আমরা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সাঁথিয়া, সুজানগর, ঈশ্বরদী, চাটমোহর, আটঘরিয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি থানার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ি।" ১৯৭১ সালে ২৯ জুন ৩৩ সদস্যের একটি গ্রুপ প্রথম ঈশ্বরদী থানার পাকশীর নিকটবর্তী বাঘাইল গ্রামে পৌঁছে। জুলাই মাসের মধ্যে আরও বেশ কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা ব্যাচ পাবনা জেলার নানা জায়গায় ঢুকে পড়ে। তাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি থানার গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৮ জুলাই, ১৯৭১: মুক্তিযোদ্ধারা পাকশী এলাকায় টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরবর্তী সময়ে জয়নগরের বিদ্যুৎ টাওয়ারে শক্তিশালী Explosive নিক্ষেপ করে তার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন।

১৪ জুলাই, ১৯৭১: ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা প্রবল শক্তি নিয়ে পাবনায় প্রবেশ করেন। এ সময় থেকেই পাবনায় স্বাধীনতা যুদ্ধের গতিধারা পাল্টে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা পাবনা জেলার সুজানগর, আটঘরিয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া,

সাতবাড়িয়া, দ্বীপচর, ঢালারচর, নাজিরপুর, টিকরী, দাপুনিয়া, মাধপুর, বাঁশেরবাদা, আওতাপড়া, চর শানিকদিয়ার, চর সদিরাজপুর প্রভৃতি স্থানে অবস্থান নেন। এ সমস্ত স্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাক-হানাদার বাহিনীর অবস্থান ও থানাগুলোতে আক্রমণ চালাতে থাকেন।

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১: সুজানগর থানার মুক্তিযোদ্ধারা দুলাই ব্রিজের ধ্বংস সাধন করেন এবং ঐ ব্রিজ পাহারারত ৫ জন রাজাকারকে হত্যা করেন।

২ নভেম্বর, ১৯৭১: মুক্তিযোদ্ধারা সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নিহত হয় রাজাকার আব্দুস সাত্তার, আব্দুস সামাদ ফকির, আব্দুল বাতেন, আকবর মৌলভি, তফিজ মোল্লা প্রমুখ।

৬ নভেম্বর, ১৯৭১: আটঘরিয়ার বংশীপাড়ায় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের শহিদ আবুল কাশেমের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বেরুয়ান গ্রামের নাম কাশেমনগর রাখা হয়েছে। অপরদিকে খিদিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে শহিদ আব্দুল খালেকের নামানুসারে।

৯ নভেম্বর, ১৯৭১: ফরিদপুর থানার ডেমরা ইউনিয়নের চিকনাই নদীর তীরে কালিয়ানী নামক স্থানে পাকসেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল ইসলাম মিন্টু, মজিবর রহমান, আঃ আউয়াল, নজরুল ইসলাম চাঁদু, আব্দুস সবুর, গোলাম মোস্তফা খান, জয়গুরু হালদার ও আবুল হাশেম শহিদ হন।

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১: গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের ঘাঁটি ফরিদপুর থানা আক্রমণ করেন। মুক্তিসেনারা কদিন আগে থেকেই বড়াল ব্রিজ ও বাঘাবাড়ী ঘাট থেকে পাকসেনাদের ফরিদপুর আসার পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে কড়া পাহাড়া বসিয়ে রাখেন। ৪ ডিসেম্বর ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। ২৩ জন পাকসেনা এই যুদ্ধে নিহত হয়। এখানে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল লতিফ এবং শামসুল ইসলাম পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়েন। এরপর পাকসেনারা ফরিদপুর থানা ত্যাগ করলে ঐ থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

ডাববাগান যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল, সোমবার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা উত্তরবঙ্গের প্রবেশপথ হিসেবে পরিচিত নগরবাড়ি ঘাট দিয়ে পাড় হয়ে যাওয়ার পথে সাঁথিয়া থানার পাইকরহাটি গ্রামের ডাববাগানের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে। সাঁথিয়া তথা এলাকার মুক্তিকামী বীরজনতা ও দেশপ্রেমিক ইপিআর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন।

ডাববাগান যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন ইপিআর হাবিলদার গাজী আলী আকবর। তিনি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার শান্তিডাঙ্গার বাসিন্দা। ডাববাগানের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। এ-যুদ্ধের বেশিরভাগ যোদ্ধা ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং আনসার সদস্য। তাদের সঙ্গে যুক্ত হন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা। পাকিস্তানি সৈন্যরা যুদ্ধে টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে পাকবাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রায় ৫০ জন পাকসৈন্য মৃত্যুবরণ করে। ডাববাগান যুদ্ধে শহিদ হন ইপিআর হাবিলদার মনতাজ আলী, হাবিলদার আব্দুর রাজ্জাক, নায়েক হাবিবুর রহমান, সিপাহী এমদাদুল হক, সিপাহী ইমান আলী, সিপাহী রমজান আলীসহ আরো নাম না-জানা অনেক ইপিআর ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রাথমিক অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধে টিকতে না পেরে পিছু হটলেও পরে তারা শক্তি সঞ্চয় করে রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর প্রবল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে অপ্রস্তুত মুক্তিযোদ্ধারা অসহায় হয়ে পড়েন পাকবাহিনীর নির্মম আক্রমণে। মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেও নিরীহ এলাকাবাসী হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায়নি। মুহূর্তের মধ্যে তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। সেদিনের নির্মমতার সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছেন আতঙ্কিত রামভদ্রবাটি, কুড়িয়াল, সাটিয়াকোলা ও বড়গ্রামের একাত্তর প্রজন্মের মানুষেরা। সেদিন প্রায় দুশো মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা।

সেদিন যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে করমজার প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান ডা. আফাজ উদ্দিন, আব্দুল লতিফ, শেখ কাজেম আলী, খোয়াজ শেখ, পিয়ার মণ্ডল, জাকের আলী শেখ, সৈয়দ আলী মোল্লা, জগনারায়ণ বিশ্বাস প্রমুখ। যে গাব গাছটির

কাছে গ্রামবাসীদের হত্যা করা হয়েছিল, তা আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরো সাক্ষী হয়ে আছে সেই ডাববাগান। যে ডাববাগানের যুদ্ধে অমিততেজী মুক্তিযোদ্ধারা সুসজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। ডাববাগানের বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে "শহিদ নগর"; আর শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে "বীর বাঙালি" ভাস্কর্য।

চাটমোহর রেলস্টেশন-সংলগ্ন ব্রিজ যুদ্ধ

১৯৭১ সালের জুন মাসের শেষের দিকে চাটমোহর রেলস্টেশন-সংলগ্ন ব্রিজের পাশে পাকসেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য হতাহত হয়। কমান্ডার ইয়াছিন আলীর নেতৃত্বে আব্দুল গণি, মোজাহার আলী চঞ্চল, আজাহার এবং আইনুলসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। এরপর আগস্ট মাসের শুরুর দিকে পাকসেনাদের বিশাল একটি গ্রুপ নৌকা ও স্পিডবোড যোগে হাণ্ডিয়াল পৌঁছে। খবর পেয়ে হাণ্ডিয়াল ও তাড়াশ থানার মুক্তিযোদ্ধারা নদীর পাড়ে এ্যাম্বুশ করেন। পাকসেনারা নদীর পাড়ে নামার সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিযোদ্ধারা গুলিবর্ষণ শুরু করেন। এতে পাকসেনারা পাল্টা আক্রমণের সুযোগ না পেয়ে বেশিরভাগই নিহত হয়। একজন পাকিস্তানি সৈন্য জীবন্ত ধরা পড়লে জনতা তাকেও পিটিয়ে হত্যা করে।

বেরুয়ান যুদ্ধ

২২ অক্টোবর, ১৯৭১: আটঘরিয়া থানার চাঁদভা ইউনিয়নের হাড়লপাড়া ও বেরুয়ান গ্রামের মাঝখানে বেরুয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন আটঘরিয়া থানা মুজিববাহিনীর লিডার আনোয়ার হোসেন রেণু। তাঁর নেতৃত্বে ৬ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল মাজপাড়া গ্রামে অবস্থান করছিলেন। অন্য মুক্তিযোদ্ধাগণ হলেন–মোঃ আলী আশরাফ, জহুরুল হক, সুলতান মাহমুদ, তোয়াজ উদ্দিন ও হায়দার আলী। তাঁরা খবর পান খিদিরপুর গ্রামে রাজাকার কমান্ডার মমিন উদ্দিনের নেতৃত্বে ১৫-২০ জন রাজাকার খিদিরপুরের বাগদিপাড়ার নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। এরপর ঐ মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রুপটি হাড়লপাড়া ও বেরুয়ানের মাঝামাঝি ভাঙা সড়কে এ্যাম্বুশের জন্য তৈরি হন। রাজকাররা সে-রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় তারা আক্রমণ করেন। শুরু হয় সম্মুখ যুদ্ধ। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের পর ১০ জন রাজাকার নিহত হয়। প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে অবশিষ্ট রাজাকাররা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে শহীদ হন দুজন মুক্তিযোদ্ধা; তাঁরা হলেন–একদন্ত ইউনিয়নের ত্রিমোহন গ্রামের তোয়াজ উদ্দিন এবং দেবোত্তর ইউনিয়নের পাটেশ্বর গ্রামের হায়দার আলী। তাঁদের মাজপাড়া গ্রামে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে এই বীর শহীদদের নামে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২ নভেম্বর, শনিবার সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে রাজাকারদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সুপরিকল্পিতভাবে চারদিক থেকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থানরত রাজাকার ক্যাম্প ঘিরে ফেলেন। কমান্ডার লোকমান হোসেনের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ স্কুলের দক্ষিণ পাশে মতলেবের বাড়ির নিকট, একটি গ্রুপ কমান্ডার আব্দুর লতিফের নেতৃত্বে হাইস্কুলের পূর্ব দিকে আনুমিয়ার দোকানের পাশে, একটি গ্রুপ কমান্ডার আব্দুর রাজ্জাক মুকুলের নেতৃত্বে হাই স্কুলের উত্তর পাশে ইছামতির ওপার জিতু দারোগার বাড়ির সামনে এবং আরেকটি গ্রুপ আফতাব উদ্দিনের নেতৃত্বে সাঁথিয়া থানার সামনে স্কুলের পশ্চিম দিকে অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর গর্জে ওঠে এলএমজি, অ্যানারগান, এসএলআর, স্টেনগান ও রাইফেল। রাজাকাররাও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। প্রায় দু-ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে অনেক রাজাকার নিহত হয়। এদের মধ্যে আব্দুস সাত্তার (নাড়িয়াগদাই), আব্দুস সামাদ (সাঁথিয়া), আব্দুল বাতেন (সাঁথিয়া), আকবর মৌলবী (মন্মথপুর), তফিজ মোল্লা (মন্মথপুর) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বংশীপাড়া যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর আটঘরিয়া উপজেলার মাজপাড়া ইউনিয়নের সোনাকন্দর ও বংশীপাড়া গ্রামের মাঝখানে চন্দ্রাবতী নদীর তীরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা বংশীপাড়া যুদ্ধ নামে পরিচিত। বংশীপাড়া ঘাট থেকে আড়াই কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে রামচন্দ্রপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সেখানে গোকুল নগর গ্রামের আনোয়ার হোসেন রেনুর নেতৃত্বে মুজিববাহিনীর একটি দল এবং ঈশ্বরদীর ওয়াছেব কমান্ডারের নেতৃত্বে আরও একটি দল অবস্থান করছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই অবস্থানের খবর পাকিস্তানি আর্মিদের কাছে পৌঁছে দেয় আটঘরিয়া থানার শান্তি কমিটির নেতা ক্বারি

ইউসুফ আলী। ঐ খবরের ভিত্তিতে ক্যাপ্টেন তাহের খানের নেতৃত্বে ১০০ জন পাকসেনার একটি দল মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করার জন্য বংশীপাড়া ঘাটে পৌঁছে। এর পর মুক্তিযোদ্ধারাও প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং শুরু হয় সম্মুখ যুদ্ধ। চন্দ্রাবতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থান নেন মুক্তিযোদ্ধারা আর পূর্ব তীরে অবস্থান গ্রহণ করে পাকিস্তানি সৈন্যরা। দীর্ঘক্ষণ চলে এই যুদ্ধ। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিক্ষেপ করা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যায় পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন তাহেরের বুক, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এর পর পাকিস্তানি বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে, মুক্তিযোদ্ধারাও প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান। এই যুদ্ধে শহীদ হন বেরুয়ান গ্রামের আবুল কাশেম, মাজপাড়া গ্রামের আব্দুল খালেক এবং ঈশ্বরদীর মুলাডুলির ইউনুস আলী। বংশীপাড়া যুদ্ধে আরও যাঁরা শহীদ হন, তাঁরা হলেন–নায়েব আলী, আব্দুর রশিদ, আব্দুল মালেক, শহীদুল ইসলাম, মুনছুর আলী, আব্দুর রাজ্জাক, নুর মোহাম্মদ, মোহসীন আলী ও আব্দুস সাত্তার। এছাড়া শহীদ হন ২২ জন নিরীহ গ্রামবাসী। এ যুদ্ধে ৩০ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহন হয়। এই যুদ্ধ সম্পর্কে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিশেষ বুলেটিন প্রচার করে। বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকা থেকে প্রচার করা হয় এই যুদ্ধের খবর। এই যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের ৫ জনকে একই কবরে এবং ২ জনকে আরেক কবরে দাফন করা হয়। শহীদ আব্দুল খালেককে মাজপাড়া গোরস্থানে দাফন করা হয়। শহীদ আব্দুস সাত্তার ও ইউনুস আলীর কবর দেওয়া হয় সোনাকন্দর গ্রামে। অন্যদের কবর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, পরে নামফলক লাগানো হয়েছে। এই শহীদদের স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে। শহীদ আবুল কাশেমের স্মৃতি স্মরণে বেরুয়ান গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে কাশেম নগর। শহীদ আব্দুল খালেকের স্মরণে খিদিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামানুসারে। শহীদ আবুল কালামের স্মরণে সোনাকন্দর গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে কালাম নগর।

কালিয়ান যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর পাবনার ফরিদপুর উপজেলার ডেমড়া ইউনিয়নের প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে চিকনাই নদী-পাড়ের কালিয়ান গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিল। 'দৈনিক নির্ভর' পত্রিকায় প্রকাশিত আব্দুদ দাইনের "কালিয়ানী সম্মুখে যুদ্ধ: সাঁথিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরব ও বেদনার স্মৃতি" শীর্ষক লেখা থেকে জানা যায়: '১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর বাংলা ২২ কার্তিক ১৩৭৮ সাল। পাক হানাদার বাহিনী পায়ে হেঁটে বাঘাবাড়ী ঘাট থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেছে। নাগডেমড়া এসে বাঁ দিকের কাঁচা রাস্তায় নেমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এসময় সাঁথিয়াতে বিভিন্ন স্থানে প্রায় দেড়-দুশো মুক্তিবাহিনীর সদস্য দুপুরের খাবার খেতে বসেছিলন। অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে পাকসেনাদের রুখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মুক্তিযোদ্ধারা। নেতৃত্ব দেন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম চাঁদ। মুক্তিযোদ্ধারা বারোয়ানী ব্রিজের নীচে পজিশন নিয়ে ফায়ার শুরু করেন। এতে পাকসেনারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের দিক পরিবর্তন করে বামে না গিয়ে ডানে মোড় নিয়ে পশ্চিম দিকে ডেমড়া হয়ে কালিয়ানী আসে এবং ফরিদপুরের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় পাকসেনারা সঙ্গে ভারী অস্ত্র বহন করছিল। সংখ্যায় ছিল প্রায় আড়াই'শ। পাকসেনারা দিক পরিবর্তন করার পর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু নেন এবং উপযুক্ত পজিশনের সুযোগ খুঁজতে থাকেন। পাকসেনারা কালিয়ান এসে নৌকাযোগে চিকনাই নদী পাড় হতে থাকে। ওইদিন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা আ. ছালাম মাস্টারের বর্ণনায় জানা যায়, এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে নদীর পাড়ে ও সড়কের পাশে পজিশন নেন। বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলে। এক সময় নদীর পাড়ে কালিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পজিশন নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি ফুরিয়ে যায়। পাকসেনারা যখন বুঝতে পারে মুক্তিবাহিনীর গুলি ফুরিয়ে গেছে তখন আবছা অন্ধকারে এলোপাথারী গুলি করতে করতে স্কুল ঘর ঘিরে ফেলে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য কিছু মুক্তিযোদ্ধা ঘরের ছাদে লুকান। পাকসেনারা সেই লুকানো মুক্তিযোদ্ধাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য যারা গ্রামের ভেতর পালিয়েছিল দালালদের সহায়তায় পাকসেনারা তাদের অনেককেই হত্যা করে। ১৪-১৫ জনকে নদীর পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়। নদী পাড় হওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে একটি নৌকা ডুবে বহু পাকসেনা নিহত হয়। এতে পাকসেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে পূর্বদিকে সতর্ক পজিশন নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে গিয়ে মাজাট ও গোলকাটা গ্রামে ঢুকে পড়ে এবং অগ্নিসংযোগ করে।

এরমধ্যে কিছু মুক্তিযোদ্ধা বড়াল নদী পার হয়ে রতনপুর ও দিঘুলিয়া গ্রামে আশ্রয় নেন। পাকসেনারা নদী পার হয়ে রতনপুর গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে এবং সামনে যাকে পার তাকেই হত্যা করতে থাকে। পাকসেনাদের হত্যার শিকার হন আবুল

হাশেম (পাবনা শহর), মজিবর, গহীর, রজব, দেরাজ, কসিম উদ্দিন, রশিদ ও তোজামসহ নদীপারের অনেক নৌকার মাঝি। সেদিন পাকসেনাদের হাতে সাঁথিয়ার যে-সকল মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন তাঁরা হলেন–নজরুল ইসলাম চাঁদ (কাশিয়াবাড়ী), আনোয়ার হোসেন মন্টু (পাটগাড়ী), আব্দুস সবুর (নাগডেমড়া), টগর আলী খান লোদী (নাগডেমরা), আঃ আউয়াল (বারোয়ানী), জয়গুরু (পানিশাইল)। মজিবর রহমান (বানিয়া বহুল) পেটে গুলি লাগা মারাত্মক আহত হন। আঃ হামিদ (নাড়িয়াগদাই) পরে বেঁচে ওঠেন।" ফরিদপুর উপজেলার চিকনাই পারের কালিয়ান গ্রাম আজো বহন করছে স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করা শহিদদের স্মৃতি ও অসীম সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা।

ঈশ্বরদী ওয়াপদা ক্যাম্পের যুদ্ধ

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে ঈশ্বরদী উপজেলার মিরকামারী গ্রামের পার্শ্ববর্তী ওয়াপদা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রাজাকার ও পাকসেনাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাকসেনা ও তাদের দোসরদের পরাস্ত করেন। কোনোরকম পরিকল্পনা ছাড়াই মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের ঘিরে ফেলেন। শুরু হয় গোলাগুলি। গোলাগুলির শব্দ পেয়ে পাকসেনারা ওয়াপদা ক্যাম্প থেকে রাজাকারদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। মুক্তিযোদ্ধারা দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তারা গ্রেনেড চার্জ করেন ও গুলি চালান। এক পর্যায়ে পাকসেনারা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়। তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। তাদের লাশ বক্তারপুর গ্রামে পুঁতে রাখা হয়।

নন্দনপুর-কোণাবাড়িয়া ব্রিজের যুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা একাধিকবার পাবনার সাঁথিয়া থানার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর সাঁথিয়া থানার প্রায় ২ কিলোমিটার পশ্চিমে নন্দনপুর-কোণাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানি সেনারা সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হয়। ৭ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা সাঁথিয়া থানা দখল করে নেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের থানা দখল করে নেওয়ার খবর অল্প সময়ের মধ্যেই পাবনায় অবস্থিত পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্পে পৌঁছালে তারা সাঁথিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। এ খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নন্দনপুর-কোণাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে অবস্থান নেন। নিজাম উদ্দিন ও লোকমান হোসেনসহ এক গ্রুপ কোণাবাড়িয়ার ভেতর দিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে কোণাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যদিকে আলতাফ হোসেন, রনজিত কুমার ও জামাত আলীসহ আরেকটি গ্রুপ দৌলতপুর ও খান মাহমুদপুরের মাঝখানে অবস্থান করেন। পাকসেনারা কোণাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে চলে আসলে শুরু হয় উভয় পক্ষের সম্মুখযুদ্ধ।

মুক্তিযোদ্ধারা দুই দিক থেকে বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে থাকেন। শুরু হয় ত্রিমুখী যুদ্ধ। নিজাম উদ্দিন ও লোকমান হোসেনের গ্রুপের গুলিতে পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি ট্রাক নষ্ট হয়ে যায়। এ যুদ্ধ প্রায় দশ ঘণ্টা ধরে চলে। সুসংগঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তারা মাধপুরের দিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেও ফেলে যায় একটি ট্রাক ও জিপ। নন্দনপুর-কোণাবাড়িয়া ব্রিজের যুদ্ধ আজও পাবনার সাঁথিয়া থানার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের পরিচয় বহন করছে।

নন্দনপুর-জোড়গাছা ব্রিজের যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর সাঁথিয়া থানা সদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে নন্দনপুর-জোড়গাছা গ্রামের মাঝামাঝি ব্রিজটির কাছে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজিত করতে পেরেছিলেন। এতে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মতি, আনছার আলী, আলতাফ হোসেন, আব্দুল লতিফ, আব্দুর রউফসহ অনেকে বীরত্বের পরিচয় দেন।

এ-যুদ্ধ সকাল থেকে শুরু হয়ে বিকাল পর্যন্ত চলে। অবিরাম গোলাবর্ষণের এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলা-বারুদের মজুদ শেষ হয়ে গেলে মুক্তিযোদ্ধারা অসহায় হয়ে পড়েন। এ-সময় মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মতির নির্দেশে নারী মুক্তিযোদ্ধা ভানুনেছা প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্বে থানা সদরে দৌড়ে চলে আসেন। তখন থানায় অবস্থানকারী আব্দুল ওয়াহাব (জিতু দারোগা) ও হয়রত আলী ভানুনেছার কাছে বস্তাভর্তি গোলা-বারুদ সরবরাহ করেন। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ভানুনেছা অনেক কষ্টে বস্তাভর্তি গোলা-বারুদ বহন করে মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙ্কারে বাঙ্কারে পৌঁছে দেন। এরপর যুদ্ধে

পাকসেনারা পিছু হটে পাবনার দিকে চলে যায়। মূলত, নারী মুক্তিযোদ্ধা ভানুনেছার বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার ফলেই এ-যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজিত করে জয়লাভ করতে পেরেছিলেন।

নকশালদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ

সারা দেশে চীনপন্থি কমিউনিস্টরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিলেও পাবনা জেলায় তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। সাহাবুদ্দিন চুপ্পু সাক্ষাৎকারে বলেছেন: 'মূলত ষাটের দশকে এডওয়ার্ড কলেজে আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন অংশটির সঙ্গে প্রায়ই সংঘর্ষ হতো। সেই দ্বন্দ্বের জের ধরেই মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা অর্থাৎ টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন মাওবাদী নকশালরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। পাকিস্তানি আর্মিরা পাবনায় এলে তারা তাদের সঙ্গে মিলে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে।' কামাল আহমেদ "৭১ চেতনায় অম্লান" (২০০৮) গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে নকশালপন্থিদের ভূমিকা সম্পর্কে অজানা বহু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। পাবনা জেলার প্রত্যন্ত চরাঞ্চল ছিল নকশালপন্থিদের শক্তিশালী অবস্থান। তাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কামাল আহমেদ বলেছেন: 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে সাহাপুরের নকশালপন্থিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান–তথা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ না মেনে নিজস্ব রাজনৈতিক লাইনে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে কোনো রকম সংঘাতে না গিয়ে এক ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যায় ঈশ্বরদী থানা ও পাবনা শহরের সংলগ্ন এলাকা ও চরাঞ্চলে।'

মুক্তিযোদ্ধা বেবী ইসলামের সাক্ষাৎকার থেকেও একই ধরনের বিবরণ জানা যায়। জহুরুল ইসলাম বিশু 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা' গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বই থেকে জানা যায় এ-সংক্রান্ত অনেক তথ্য।

'১৯৭১ সালের ১ রমজান পাবনা সদর থানার তিনগাছা বাবুদের বাগানে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা টিপু বিশ্বাসের বাহিনী নকশালের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে নকশালদের ৩৪ জন নিহত হয়। দুটি ব্রিটিশ এলএমজি, একটি ব্যাটাগানসহ ২৮টি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। ওই যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা মহরম এবং ছানা শহীদ হন।'

জহুরুল ইসলাম বিশু 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা' গ্রন্থে আরও লিখেছেন: '১৯৭১ সালের ১৭ রমজান সন্ধ্যায় আর একটি ভয়াবহ যুদ্ধ হয় পাবনা সদর থানার প্রতাপপুর গ্রামে। এ যুদ্ধটাও মুক্তিযোদ্ধা বনাম নকশাল ও আলবদর বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয়। নকশালদের পক্ষে নেতৃত্ব দেয় কুখ্যাত চরমপন্থি নেতা টিপু বিশ্বাস নিজে। তার সহযোগিতায় ছিল শহীদ ও মাসুদ গং। নকশালরাই প্রথম যুদ্ধের সূচনা করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতা কোরবান মালিথার বাড়ি আক্রমণ করে। কোরবান মালিথাকে হত্যা করে এবং তার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। অতঃপর জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে তাকে পুড়িয়ে মারে। তারপর প্রতাপপুরের সমস্ত বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। ওই যুদ্ধে কোরবান মালিথাসহ বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিয়ার জয়নাল শহীদ হন।' (পৃ. ৭৯)

'নকশালদের বিরুদ্ধে পাবনা সদর থানায় সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় সানিকদিয়ার চরে। ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর এ যুদ্ধে জাহাঙ্গীর আলম সেলিম, আবদুল হামিদ, শাহজাহানসহ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং নকশালদের সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন রফিকুল ইসলাম বকুল, বেবী ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম সেলিম, ইকবাল হোসেন, ফজলুল হক মন্টু, আবুল কালাম আজাদ, ইসরাইল হোসেন মেসের, সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, শামসুল আলমসহ অনেকে।'

পাবনার মানুষ চিরকালই অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নানা আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনীর সৈন্যরা পাবনায় আসে। এর আগে পাবনার মানুষ প্রতিরোধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে প্রতিরোধ করলেও পরে ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে তাঁরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি আর্মি, রাজাকার-আলবদর এবং নকশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক সম্মুখ যুদ্ধে তাঁরা অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয় আর্জন করেন। এসব যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বধ্যভূমি ও গণকবর

মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ, আমাদের বেদনা। নয় মাস ধরে চলা মুক্তির সংগ্রামে আমরা হারিয়েছি অসংখ্য মানুষ। আমরা হারিয়েছি আমাদের স্বজন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদেও শাসন করেছে, শোষণ করেছে। সেই শাসন, সেই শোষণ থেকে যখন আমরা বেরিয়ে এসে মুক্তির পথ খুঁজলাম, যখন আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মুক্তির লড়াইয়ে নামলাম, তখন ফুটে ওঠে পাকিস্তানিদের দানবীয় চেহারা।

সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর–রাজাকার, আলবদর, আলশামস শুরু করে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বাড়ি থেকে নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে, কখনো একই বাড়ির-একই এলাকার অসংখ্য মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে তারা শুরু করে গণহত্যা। বর্বরোচিত এবং জঘন্য এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের এক গোপন সভায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, 'তিন মিলিয়ন বাঙালি খতম করে দাও।' সত্যিকার অর্থে ১৯৭১ সাল জুড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় সহযোগিরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণাই বাস্তবায়িত করে। তাদের দ্বারা পরিচালিত সেই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে এই ব-দ্বীপ। প্রাণ হারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় গণহত্যাকে। পাকিস্তানিদের দ্বারা ইতিহাসের সেই নিকৃষ্ট হত্যাকাণ্ড বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যান্য গণহত্যাকেও হার মানায়। 'গ্রিক শব্দ Genos এবং ল্যাটিন শব্দ Cide যুক্ত করে গণহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Genocide শব্দের উৎপত্তি। Genos অর্থ হচ্ছে জাতি, শ্রেণি, সেক্স আর Cide অর্থ হত্যা। (যেমন: হোমিসাইড, ফ্রাস্টিসাইড ইত্যাদি)। আন্তর্জাতিক আইনে Genocide বা গণহত্যা কথাটির অর্থ হলো–কোন সরকার দ্বারা ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন জাতিগত, ধর্মীয় বা গোত্রীয় দলভুক্ত জনগণের বিনাশ করা। গণহত্যা সুপ্রাচীন কাল থেকে সংঘটিত হয়ে এলেও গণহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Genocide অভিধাটি একান্তই হাল আমলের বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাফায়েল লেমকিন প্রথম এই অভিধাটি ব্যবহার করেন।'

জাতিসংঘের একটি কনভেনশনে জেনোসাইড বা গণহত্যার সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়, '১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত রেজুলেশন ২৬০(৩) এর অধীনে গণহত্যা এমন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় যা বিশ্বময় প্রতিরোধে সকল রাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই গণহত্যা বলতে বোঝায় এমন কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে একটি জাতি, ধর্মীয় সম্প্রদায় বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে বা হচ্ছে।

সংজ্ঞা অনুযায়ী গণহত্যা কেবল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ২৬০(৩) এর অনুচ্ছেদ-২ এর অধীনে যে কর্মকাণ্ডকে আইনগতভাবে গণহত্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তা হলো: ক) পরিকল্পিতভাবে একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য তাদের সদস্যদেরকে হত্যা বা নিশ্চিহ্নকরণ। খ) তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিসাধন। গ) পরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে ধবংস সাধনকল্পে এমন জীবননাশী অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে তারা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঘ) এমন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যাতে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর জীবনধারণে শুধু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি নয়, সেই সাথে তাদের জন্ম প্রতিরোধ করে জীবনের চাকাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। ঙ) একটি জাতি বা গোষ্ঠীর শিশু সদস্যদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে তাদের জন্ম পরিচয় ও জাতিগত পরিচয়কে মুছে ফেলাকেও গণহত্যা বলা হয়।'

জাতিসংঘের সংজ্ঞা এবং পরিধি অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে গণহত্যার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। এ সময়ে 'পাকিস্তানি সৈন্যরা একমাত্র ঢাকাতেই হত্যা করেছে এক লক্ষ মানুষকে। আর খুলনায় দেড় লক্ষ, যশোরে পঁচাত্তর হাজার, কুমিলায় পঁচানব্বই হাজার এবং চট্টগ্রামে এক লক্ষ। এই অনুপাতে ১৮টি জেলায় নিহতের সংখ্যা বিশাল হয়ে দাঁড়ায়।'

অন্যদিকে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির চলতি গবেষণায় বলা হয়েছে 'পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের দোসররা ১৯৭১ সালে দেশে যে ব্যাপক গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালায়, তাতে প্রায় সাড়ে বারো লাখ লোক নিহিত হয়ে যায়।'

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর টার্গেট বা গণহত্যার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন–'আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী ও সমর্থক এবং মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারসহ মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাকারী জনসাধারণ, ইস্টবেঙ্গল

রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও স্বেচ্ছাসেবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষক সর্বোপরি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সমাজসেবক ও প্রগতিশীল মানুষ এবং নারী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়।'

'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' বইয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা প্রসঙ্গে অ্যান্থনী মাসকারেনহাস বলেছেন, 'হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছিল। কারণ শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে মনে করত 'ভারতের অনুচর'। তারা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কলুষিত করে ফেলছে। বাঙালি সামরিক পুলিশ বাহিনীর লোকদের অনুসন্ধান করার কারণ তারাই একমাত্র শিক্ষিত দল, যারা সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ দিতে সমর্থ। অন্যদেরকে গণহত্যার আওতাভুক্ত করার কারণ তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রাষ্ট্রে অখণ্ডতার প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকিস্বরূপ মনে করা হচ্ছিল।'

দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী এবং এদেশের রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডের যে তাণ্ডব চালায় তা থেকে মুক্ত ছিল না পাবনা জেলাও। মার্চে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরুর পর থেকে একাত্তর সাল জুড়েই গণহত্যা এবং পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা বাস্তবায়িত করে পাকিস্তানিরা। সারা দেশের মতো পাবনাতেও ছড়িয়ে রয়েছে পাকিস্তানিদের নির্মমতার চিহ্ন। ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গণকবর, বধ্যভূমি। সেইসঙ্গে পাবনাতেও সে সময়ে হত্যা করা হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের। স্বাধীনতার ৪৩ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার সাক্ষী গণকবরগুলোর সব চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৯ সালের আগে পর্যন্ত সারাদেশের গণকবর, বধ্যভূমিগুলোর কোনো পরিসংখ্যানই তৈরি হয়নি। পরবর্তীকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৩৬টি জেলায় সাড়ে তিন-শ বধ্যভূমি চিহ্নিত করা হয়। আর ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি বলছে, 'এ যাবত ৯২০টি গণহত্যা ও গণকবর স্পষ্ট আবিস্কৃত হলেও মূল গণকবরের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি। ...৮৮টি নদীর তট ও ৬৫টি ব্রিজের উপর পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকসেনারা নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। সেসব স্থান সবগুলো আজও যথাযথভাবে চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। এসব স্থানের কতকগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আবার কতকগুলো অবহেলায় পড়ে আছে। কোনো কোনো স্থানে গণকবর চিহ্নিত করে স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে। পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে চিহ্নিত ও সংরক্ষিত গণকবর ও বধ্যভূমির পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো।

গোপালপুর আট শহীদের সমাধি, পাবনা

পাবনা শহরের জেলা স্কুলের পাশে মওলানা কসিমুদ্দিন আহম্মেদ রোডে আট শহীদের শান বাঁধানো সমাধি রয়েছে। এই সমাধিতে যাঁরা ঘুমিয়ে আছেন তাঁরা হলেন–শহীদ আশরাফ আলী আক্কেল, শহীদ আকবার আলী, শহীদ আফছার আলী, শহীদ মোশাররফ হোসেন মুশা, শহীদ শফিউদ্দিন এ্যাডভোকেট, শহীদ হারুন-অর-রশিদ, শহীদ নুরুল হক ও শহীদ শফিউন্নবী সূর্য। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল পাকসেনাদের গুলিতে এঁরা শহীদ হন।

নাজিরপুর বধ্যভূমি, পাবনা

পাবনা সদরের হেমায়েতপুর ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামে ১৯৭১ সালের ১লা ডিসেম্বর পাকবাহিনী গণহত্যা চালায়। এক একে দাঁড় করিয়ে ৬১ জন মানুষকে হত্যা করে পাকবাহিনী। পরে শহিদদের গণকবর দেওয়া হয়। এই বধ্যভূমির চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

ডেমড়া বধ্যভূমি, সাঁথিয়া

১৯৭১ সালের ১৪ মে পাকসেনারা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় সাঁথিয়া থানার রূপসী ও ডেমড়া গ্রামে। ঐদিন প্রায় সাড়ে ৮-শ গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়। পরে তাঁদের গাদাগাদি করে কবর দেওয়া হয়। বর্তমানে সে-গণকবর ও বধ্যভূমির স্থান চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ধুলাউরি গণকবর, সাঁথিয়া

১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর সাঁথিয়া থানার ধুলাউরি গ্রামে আশ্রয় নেওয়া বিভিন্ন গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ও ঘুমন্ত গ্রামবাসীর ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় পাকিস্তানি সৈন্যরা। গভীর রাতে অতর্কিতে তাঁদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। হানাদার বাহিনীর দোসর স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী সেদিন ৯ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে।

একইসঙ্গে সেদিন হত্যা করা হয় ২৭ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে। সেদিন যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন–আতাইকুলা ইউনিয়নের পদ্মবিলা গ্রামের খবির উদ্দিন, রঘুনাথপুর গ্রামের চাঁদ আলী বিশ্বাস ও দারা মিয়া, বামনডাঙ্গা গ্রামের মোকছেদ আলী বিশ্বাস, ইসলামপুর গ্রামের আক্তার আলম, কাজীপুর গ্রামের মহসীন (মধু), সুজানগর উপজেলার শাহজাহান আলী ও মোসলেম উদ্দিন। এছাড়া ধুলাউড়ি গ্রামের ডাক্তার আব্দুল আওয়াল খলিফা, ডাক্তার আবুল কাশেম ফকির, আব্দুর রশিদ, জহুরুল ইসলাম ফকির, ওয়াজেদ আলী সরদার, কোবাদ আলী বিশ্বাস, আবু নাঈম খলিফা, আব্দুল গফুর ফকির, সামাদ ফকির, শিহাব উদ্দিন শেখ, শামছুর রহমান, আক্তার হোসেন তালুকদার, লাখন বেওয়াসহ ২৭জন। যে-স্থানে শহিদদের গাদাগাদি করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে বর্তমানে গণকবর ও স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। এই গণকবর ও স্মৃতিস্তম্ভ আজও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গৌরবময় আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করায়।

শহীদনগর গণকবর, সাঁথিয়া

১৯৭১ সালের ১৯ শে এপ্রিল সাঁথিয়া থানার পাইকারহাটি গ্রামের ডাববাগান নামক স্থানে পাকসেনাদের হাতে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাদের গণকবর চিহ্নিত করা হয়েছে ডাববাগান তথা 'শহীদনগর' নামক স্থানে।

করমজা বধ্যভূমি, সাঁথিয়া

সাঁথিয়া থানার করমজা গ্রামে একটি বধ্যভূমি চিহ্নিত করে দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাঁথিয়া উপজেলার করমজা ইউনিয়নে বেড়া-সাঁথিয়া সংযোগ সড়কের পাশে নিরিবিলি স্থান করমজা গ্রামের হিন্দু ও মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে রাখে। ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অধ্যাপক ড. আবু সাইয়িদ তথ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে এই বধ্যভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা যায়, এখানে করমজা গ্রামের অনেক হিন্দু ও মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল।

টেবুনিয়া গণকবর, ঈশ্বরদী

টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামারের 'সি-ব্লকের' পুকুর পাড়ে গণকবর চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে ২০ জন শহীদ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

শহীদ তিন ভাইয়ের সমাধি, ঈশ্বরদী

ঈশ্বরদী ইপিজেডের পূর্ব পাশের রাস্তার ধারে রেলওয়ে গোরস্থানের সামান্য দক্ষিণে ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল তিন সহোদর লতিফ, আনু ও নাতুকে হত্যা করে পাকসেনারা। এখানেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়। পরে তিন সহোদের সমাধি ইট-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়। বর্তমানে স্থানটি 'শহীদ তিন ভাইয়ের সমাধি' নামে পরিচিত।

পাঁচ শহীদের গণকবর, ঈশ্বরদী

ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের পাশে পাঁচ শহীদের গণকবর চিহ্নিত করা হয়েছে।

শহীদ দারোগা আব্দুল জলিলের কবর, আটঘরিয়া

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ মালিগাছা রণাঙ্গনে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন দারোগা আব্দুল জলিল। আটঘরিয়া উপজেলার দেবোত্তর বাজার মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবরটি চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

বংশীপাড়া গণকবর, আটঘরিয়া

১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর আটঘরিয়া উপজেলার মাঝপড়া ইউনিয়নের চন্দ্রাবতী নদীর তীরে বংশীপাড়া ঘাটে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শহিদ হন ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা ও ২২ গ্রামবাসী। এই বংশীপাড়া গ্রামে একটি গণকবর রয়েছে।

চার শহীদের কবর, সুজানগর

সুজানগর শহীদ দুলাল পাইলট স্কুলের মাঠের পূর্ব-দক্ষিণ পাশে রাস্তার উত্তর দিকে চার শহিদের শান বাঁধানো কবর রয়েছে। এই চার শহিদ হলেন শহিদ দুলাল (১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সুজানগর থানা দখলের সময় সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ), শহিদ নূরুল ইসলাম (১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সুজানগর থানা দখলের সময় সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ), শহীদ আবু বকর ও শহিদ আব্দুস সাত্তার (১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সুজানগর থানার পুলিশের গুলিতে শহীদ)।

শহীদ মহরমের কবর, দাপুনিয়া, পাবনা

পাবনার দাপুনিয়া ইউনিয়নের তিনগাছা বাবুর বাগানে যুদ্ধে শহিদ মহরমের কবর দাপুনিয়ায় সংরক্ষণ করে শান বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শহীদ সানাউল্লাহ্ খাঁর কবর, দাপুনিয়া, পাবনা

পাবনার দাপুনিয়া ইউনিয়নের তিনগাছা বাবুর বাগানে যুদ্ধে শহীদ সানাউল্লাহ্ খাঁর কবর দাপুনিয়ায় সংরক্ষণ করে শান বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সেলিমের কবর, হেমায়েতপুর, পাবনা

পাবনা শহরের হিমায়েতপুর গ্রামে শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সেলিমের শান বাঁধানো কবর সংরক্ষণ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ ও ভাস্কর্য

পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ও বেদনার স্মৃতি অম্লান করে রাখা হয়েছে। কোথাও পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধের স্মৃতি, কোথাও পাকসেনাদের নৃশংসতার স্মৃতি; আবার কোথাও মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ও চেতনার স্মারক-স্বরূপ স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-সংবলিত ভাস্কর্য, স্তম্ভ, কমপ্লেক্স ইত্যাদির পরিচয়-

দুর্জয় পাবনা, পাবনা

পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে জেলা প্রশাসন অফিসের পাশে ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'দুর্জয় পাবনা' - (১) স্মৃতিসৌধের প্রথম বেদীর ব্যাস হচ্ছে ২৫ ফুট এবং এটিকে সমান সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বেদীটির সাতটি ভাগ ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ বুঝাবে। আর ২৫ ফুট ব্যাস ২৫শে মার্চের কালোরাত বুঝাবে। (২) স্মৃতিসৌধের

দ্বিতীয় বেদীর ব্যাস ১৬ ফুট যা দ্বারা ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বরের মহান বিজয় দিবস বুঝাবে। এ বেদীর ওপর রয়েছে ৯ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট চারটি মানব প্রতিকৃতি। ৯ ফুট উচ্চতা দ্বারা স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস আর চারটি মানব প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি প্রতিফলিত হবে। (৩) দ্বিতীয় বেদীর ওপর হতে স্তম্ভের শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা ২৬ ফুট যা ২৬ মার্চে মহান স্বাধীনতা দিবস বুঝাবে। (৪) স্তম্ভের শীর্ষে জাতীয় পতাকা শোভা পাবে।' 'দুর্জয় পাবনা' মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের গৌরব বহন করছে।

গোপালপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ, পাবনা

'১১ এপ্রিল বিকেলে পাবনা শহরের ভেতরে পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করে পুলিশ লাইন, সার্কিট হাউস, ডাকবাংলো, বিসিক ও ওয়াপদার দিকে যেতে থাকে। এদের একটি দল পলিটেকনিক পার হয়েই ডান দিকে ফজলুল হক রোড দিয়ে রক্ষাকালী মন্দিরের কাছে তিন মাথায় পৌঁছে। সেখানে ডা. বিহারী সাহার গোবিন্দবাড়ি মন্দিরে অনেক লোক এসে আশ্রয় নিয়েছিল। বর্বর সেনাবাহিনী সেই বাড়ি থেকে, মন্দিরের ভেতর এবং রাস্তার আশেপাশে লুকিয়ে থাকা সবাইকে ধরে রক্ষাকালীবাড়ি মন্দিরের সামনে এনে লাইনে দাঁড় করিয়ে নৃশংসভাবে গুলি চালায়। এখানে প্রায় ২০-২৫ জন নিহত হন।' এই শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয় গোপালপুর স্মৃতিসৌধ।

পুলিশ প্যারেড মাঠ শহীদ স্মৃতিসৌধ, পাবনা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাবনায় কর্মরত অনেক পুলিশ শহীদ হয়েছিলেন। সেই শহীদদের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখতে পাবনা পুলিশ লাইনের পাশে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'স্মৃতিসৌধ'।

পাবনা বাস টার্মিনাল শহীদ স্মৃতিফলক, পাবনা

পাবনা শহরের প্রবেশপথে ঢাকা রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে টামিনালের পূর্ব প্রান্তে একটি শহীদ স্মৃতিফলক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল এই স্মৃতিফলকে পাবনা জেলার শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে।

মাধপুর ঐতিহাসিক বটতলা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ, পাবনা

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ পাকসেনাদের পাবনা থেকে পালানোর সময় সেনাবহরের সাথে সর্বস্তরের মুক্তিকামী জনতার যুদ্ধে অনেকে শহীদ হন। এই যুদ্ধ ও যুদ্ধের শহীদদের স্মৃতি স্মরণে মাধপুর নামক স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'।

কুচিয়ামোড়া তিন শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ, পাবনা

১৯৭১ সালের ১৪ অক্টোবর পাবনার কুচিয়ামোরায় মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মতি, শহিদ আব্দুল মান্নান ও শহিদ পল্টু মোহন চৌধুরীকে রাজাকাররা হত্যা করে মাটিচাপা দেয়। তাঁদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে, যা 'কুচিয়ামোড়া শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' নামে পরিচিত।

ডেমড়া শহীদ স্মৃতিসৌধ, সাঁথিয়া

১৯৭১ সালের ১৪ মে শুক্রবার পাকসেনারা সাঁথিয়া উপজেলার ডেমরা গ্রামকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং গুলি চালিয়ে ও বেয়নেট চার্জ করে কয়েক-শ নর-নারীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ডেমরার শহীদদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সাঁথিয়া উপজেলার ডেমড়া গ্রামে নির্মাণ করা হয়েছে "ডেমড়া শহীদ স্মৃতিসৌধ"।

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়স্তম্ভ, সাঁথিয়া

সাঁথিয়া পরিষদ উপজেলা কার্যালয়ের প্রবেশপথে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ধারণকারী বিজয়স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। লাল-সবুজের পতাকার আদলে নির্মিত এই সৌন্দর্যমণ্ডিত স্তম্ভ জাতীয় দিবসগুলোতে ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়।

‘বীর বাঙালি’ ভাস্কর্য, সাঁথিয়া

১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল পাইকারহাটি গ্রামের ডাববাগান নামক স্থানে পাকসেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে ইপিআর কমান্ডার আকবর আলীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে পাকবাহিনী পিছু হটে যায় এবং বিপুল শক্তি নিয়ে আবারও আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে পাকসেনাদের হাতে নিরীহ গ্রামবাসীসহ অনেক ইপিআর জোয়ান ও মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। পাকবাহিনীরও অনেক সৈন্য নিহত হয়। পরে স্থানটির নামকরণ হয় ‘শহীদনগর’। এখানকার মুক্তিযুদ্ধের গৌরব অম্লান করে রাখতে ২০০০ সালে ‘বীর বাঙালি’ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়।

ধুলাউরি শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ, সাঁথিয়া

১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর রাত প্রায় ৩টার দিকে হানাদার দস্যুরা রাজাকারদের সহায়তায় ধুলাউড়ি গ্রামে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অতর্কিত হামলা করে। তাদের হামলায় ধুলাউড়িতে ৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ২৭ জন নিরীহ গ্রামবাসী শহিদ হন। একইস্থানে রয়েছে ৮ জন মুক্তিযোদ্ধার কবর। ধুলাউরিতে শহীদ হয়েছিলেন–শহীদ দারা মিয়া, শহীদ চাঁদ আলী বিশ্বাস, শহিদ আখতার হেসেন, শহিদ খবির উদ্দিন বিশ্বাস, শহীদ মহসিন আলী মধু, শহীদ শিহাব উদ্দিন শেখ, শহীদ শামছুর রহমান, শহীদ মোকছেদ আলী ও শহীদ আব্দুস সামাদ। এখানকার শহীদদের স্মরণে নির্মাণ করা হয়েছে “ধুলাউড়ি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ”।

বাঘাইল শহীদ স্মৃতিফলক, ঈশ্বরদী

বাঘাইলে ২৩ এপ্রিল ’৭১, হানাদার পাকবাহিনী তাদের দোসর রাজাকার শান্তিকমিটির লোকজনের সহযোগিতায় নির্বিচারে নৃশংসভাবে ২৩ জন নারী, পুরুষ, শিশু ও গর্ভবতীকে হত্যা করে। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এলাকার লোকজন এখানে স্মৃতিফলক নির্মাণ করেছে। এতে শহীদদের নাম উৎকীর্ণ আছে।

আলহাজ্ব মোড় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ, ঈশ্বরদী

পাবনা-রাজশাহী বিশ্বরোড থেকে দাশুড়িয়া হয়ে ঈশ্বরদী প্রবেশের পথে আলহাজ্ব মোড়ের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে শহিদদের স্মৃতিস্তম্ভ।

সাতবাড়িয়া শহীদ স্মৃতিসৌধ, সুজানগর

১৯৭১ সালের ১২ মে ১০-২০ ট্রাকযোগে ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকসেনারা ঢুকে পড়ে সুজানগর থানার সাতবাড়িয়া গ্রামে ১০ ঘণ্টা হত্যাযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগ চালায়। এখানে প্রায় ৮০০ নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয়। এখানে নির্মাণ করা হয়েছে “সাতবাড়িয়া শহীদ স্মৃতিসৌধ”।

বনওয়ারী নগর ফরিদপুর শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ, ফরিদপুর

ফরিদপুর উপজেলা মুক্তিযুদ্ধের বহু গৌরব ও বেদনার সাক্ষ্য বহন করছে। ফরিদপুরের মাজাট, কালিয়ানী, ডেমড়া, গোপালনগর প্রভৃতি স্থানে পাকসেনারা নির্মমভারে হত্যাকাণ্ড চালায়। এতে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ শহিদ হন। এই শহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ফরিদপুর থানার রাজবাড়ির পাশে নির্মাণ করা হয়েছে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ।

বংশীপাড়া শহীদ স্মৃতিফলক, আটঘরিয়া

আটঘরিয়ার বংশীপাড়া নির্মাণ করা হয়েছে “বংশীপাড়া শহীদ স্মৃতিফলক”। যে আটজন শহীদের স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে তাঁরা হলেন–নায়েব আলী, আবদুর রশিদ, আবদুল মালেক, শহিদুল ইসলাম, মুনসুর আলী, আবদুর রাজ্জাক, নূর মোহাম্মদ ও মহসীন আলী। ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর বংশীপাড়া যুদ্ধে এঁরা শহিদ হন।

বংশীপাড়া শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ, আটঘরিয়া

আটঘরিয়ার চন্দ্রাবতী নদীর তীরে বংশীপাড়া ঘাটে ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর পাকসেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন ১৩ মুক্তিযোদ্ধা ও ২২ জন নিরীহ গ্রামবাসী। শহিদদের স্মৃতি অবিনশ্বর করে রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নির্মাণ করা হয়েছে "বংশীপাড়া শহিদ স্মৃতিসৌধ"।

শহীদ স্মৃতিসৌধ, ভাঙ্গুড়া

ভাঙ্গুড়া উপজেলা সদরের ভাঙ্গুড়া বাসস্ট্যান্ডের উপর শহিদদের স্মৃতিরক্ষার্থে শহীদ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

গুণাইগাছা শহীদ স্মৃতিফলক, চাটমোহর

চাটমোহরের গুণাইগাছা হাটখোলায় ১৯৯৫ সালে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে শহীদ স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে। শহীদ অজিত কুমার দে, শহীদ গোবিন্দচন্দ্র দে ও শহিদ রবীন্দ্রনাথ গোস্বামীর স্মরণে এই স্মৃতিফলক নির্মিত হয়েছে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা এবং জঘন্যতার চূড়ান্ত উদাহরণ বুদ্ধিজীবী হত্যা। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে আমাদের হারাতে হয় জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বুদ্ধিজীবীদের। পতন এবং পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের মেধাশূন্য জাতিতে পরিণত করার নীল নকশা অনুযায়ী হত্যা করে বুদ্ধিজীবীদের। আর তাদের এ কাজে সহায়তা করে এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর বাহিনী।

হানাদার বাহিনী রাজাকার-আলবদরদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তালিকা তৈরি করেছে। সেই তালিকা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের চিনিয়ে দেবার কাজ করেছে রাজাকার-আলবদর বাহিনী। কখনো কখনো তারা নিজেরাও এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে, নিজেদের তালিকা অনুযায়ী বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে বুদ্ধিজীবীদের।

১৯৭১ সালের ২২ এপ্রিল হানাদার বাহিনী কর্তৃক জামালপুর দখলের পর ময়মনসিংহ জেলা ইসলামী ছাত্র সংঘের তৎকালীন সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম গঠিত আলবদর বাহিনী অল্প সময়ের মধ্যেই সারাদেশে তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় এই বাহিনীর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের নভেম্বরের মধ্যেই তারা চূড়ান্ত করে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা। ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে হত্যা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কলেজ শিক্ষকসহ খ্যাতনামা সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিক্ষানুরাগীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এ তালিকা থেকে বাদ যাননি। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ১০৭৬ জন বুদ্ধিজীবীর নাম জানা যায়। অনেকের নাম এখনো অজানা।

পাবনা জেলার অনেক বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি, শহীদ মওলানা কসিমুদ্দিন আহমদ, শহীদ এম এ গফুর, শহীদ শিরু মাস্টার, শহীদ শিবাজী মাস্টার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকে নীতিগতভাবে সমর্থন করতেন। ছাত্র-যুবকদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নের বীজ বপন করতেন। আমরা কয়েকজনের পরিচয় তুলে ধরছি।

শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. ফজলে রাব্বি

জন্ম ১৯৩২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, পাবনার ছাতিয়ানি গ্রামে। পিতা আফসার উদ্দীন আহমদ, মাতা সুফিয়া বেগম। তিনি ১৯৪৮ সালে পাবনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৫৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে স্বর্ণপদকসহ এমবিবিএস পাস করেন। কর্মজীবন শুরু ১৯৫৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সহকারী সার্জন হিসেবে। ১৯৫৯ সালে মেডিসিনের রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। ১৯৬০ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য এডিনবরা যান। তিনি কার্ডিওলজিতে এমআরসিপি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে লন্ডন থেকে জেনারেল মেডিসিনেও এমআরসিপি ডিগ্রি লাভ করেন। একইসাথে লন্ডনের হ্যামারস্মিত হাসপাতালে সিনিয়র রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৩ সালে দেশে ফিরে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক (মেডিসিন) পদে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে প্রফেসর অব মেডিসিন ও প্রফেসর অব কার্ডিওলজির দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি গণমুখী চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে সচেষ্ট ছিলেন। অধ্যাপক ডা. ফজলে রাব্বি ছিলেন রাজনীতিসচেতন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৬৬-র ৬-দফা আন্দোলন, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান এবং ৭১-র মুক্তিযুদ্ধে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে আল-বদর বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনারা তাকে ৭৫, সিদ্ধেশ্বরীর (ঢাকা) বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর ধানমন্ডির সাত মসজিদ রোডে অবস্থিত ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে ফেলে রাখে। গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তাঁর সমস্ত শরীর, বুক চিরে বের করে আনা হয় তাঁর হৃৎপিণ্ড। ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে 'শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাস।' পাবনার একটি সড়কের নাম করা হয়েছে তাঁর নামে। বাংলাদেশ সরকার তাঁর নামে প্রকাশ করেছে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক ডাকটিকেট।

শহীদ বুদ্ধিজীবী মওলানা কসিমুদ্দিন আহমেদ

জন্ম ১৯১৭ সালে। পৈতৃক নিবাস তৎকালীন পাবনা জেলার উল্লাপাড়া থানার গাড়াদহ ইউনিয়নের পুরানটেপরি গ্রামে। পিতার নাম মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি ১৯৩৪ সালে সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ফাজিল এবং ১৯৩৬ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল ডিগ্রি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং ১৯৩৯ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। কর্মজীবন শুরু ১৯৩৯ সালে দিনাজপুর জেলা স্কুলের দ্বিতীয় মৌলভী হিসেবে। দেশবিভাগের পূর্বে তিনি দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮ সালে পাবনা জেলা স্কুলে হেডমৌলভী পদে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি বহু সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি পাবনা শহরের পুরাতন টেকনিক্যাল স্কুল হোস্টেলে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থায়ী ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। ১৯৭১ সালে পাবনা শহরের একটি বাস স্টপেজ থেকে তাঁকে আটক করে নূরপুর সেনাছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হয়। এরপর ১৩ই জুন সাঁথিয়ার (বর্তমানে আতাইকুলার) মাধপুরের ইছামতি নদীর তীরে নিভৃত বাঁশঝাড়ের মধ্যে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মওলানা কছিমুদ্দিনের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৭২ সালের ২৭শে মে 'পাবনা মুসলিম ইনস্টিটিউটে'র নামকরণ করা হয় 'শহিদ মওলানা কসিমুদ্দিন আহমেদ স্মৃতিকেন্দ্র'। এছাড়া ২০০৬ সালে পাবনা শহরে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'মাওলানা কসিমুদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন'।

শহীদ এম এ গফুর

জন্ম আটঘরিয়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের কৈজুরী শ্রীপুর গ্রামে ১৯১৩ সালের ৩ এপ্রিল। পিতা পালন সরকার, মাতা গোলেজান নেসা। পড়ালেখার হাতেখড়ি সঙ্গীত শিক্ষার মাধ্যমে এবং তা হয় নবদ্বীপ হালদার ও অশ্বিনীকুমার রায়ের কাছে। তিনি ১৯৩২ সালে কলকাতায় নজরুল ও রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি উচ্চাঙ্গ, খেয়াল, ঠুংরী এবং আধুনিক গানে দক্ষতা অর্জন করেন। লোকসঙ্গীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রসারে তাঁর অবদান অতুলনীয়। ১৯৪০ সালে বগুড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে 'গৌরাঙ্গ সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৪১ সালে পাবনা গোপালচন্দ্র ইনস্টিটিউট থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। লালন সঙ্গীত সংগ্রহে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি অসংখ্য গানের গীতিকার। ষাটের দশকের শেষভাগে যুক্ত হন ঢাকা বেতারের সাথে। তাঁর পরিকল্পনা ও সঙ্গীত পরিকল্পনায় ঢাকা থেকে প্রথম নির্মিত হয় 'লালন ফকির' ছায়াছবি। 'পাবনা ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস'-এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক শিক্ষক। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট পাকবাহিনী তাঁকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে নির্মমভাবে হত্যা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর শিষ্য দেলোয়ার হোসেন প্রতিষ্ঠা করেন শহিদ এম এ গফুর সঙ্গীত বিদ্যালয়। সরকার শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরিজ তাঁর নামে

ডাকটিকেট প্রকাশ করেছে। তাঁকে যখন হত্যা করা হয় তখন তাঁরই কণ্ঠে রাজশাহী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার হচ্ছিল 'এ বড় আজব কুদরতি' গানটি।

চূড়ান্ত বিজয়

মুক্তিযোদ্ধাদের অমিতবিক্রমী লড়াই ও গেরিলা আক্রমণে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায় অনেক। কোথাও কোথাও সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলে সীমান্ত এলাকা ছেড়ে সেনানিবাস এবং বড় বড় শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানিরা। এ সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে আসে বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ এলাকা। পুরো নভেম্বর মাস জুড়ে মুক্তিযোদ্ধারা সারা দেশে পাকিস্তানিদের পর্যুদস্ত করে তোলে। বিভিন্ন থানা শহর মুক্ত হতে থাকে। পাকিস্তানিরা পিছিয়ে এসে জেলা শহরগুলোতে অবস্থান নেয়।

পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণ ও ভারতীয় বাহিনীর বোমার্ষণের ফলে পাকসেনারা আত্মসমর্পণ ও পরাজয় স্বীকার করে। প্রথম পর্যায়ে ১ এপ্রিল ঈশ্বরদী বিমানবন্দরে অবস্থানরত পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। এরপর আটককৃত সেনাদের ৬ জনকে (পাঞ্জাবি) পাকশীর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ সংলগ্ন পদ্মার তীরে নিয়ে হত্যা করা হয়।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পাবনা জেলায় নব উদ্দীপনায় লড়াই শুরু করেন মুক্তিযোদ্ধারা। একের পর এক পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদরদের পরাজয়ের খবর আসতে থাকে। পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের পরাজয়ের খবর আসতে থাকে। আত্মসমর্পণ করে বিভিন্ন থানা ও ক্যাম্পে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা।

৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১: পাবনা জেলার ফরিদপুর থানা মুক্ত হয়।

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১: এই দিন সাঁথিয়া হানাদার মুক্ত হয়।

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১: দুপুরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর দুটি বিমান পাবনা শহরের বেশ কয়েকটি স্থানে বোমাবর্ষণ করে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা সুজানগর থানা আক্রমণ করেন। ২ দিন যুদ্ধ চলার পর পাকসেনারা পালিয়ে যায়। এদিকে চাটমোহর মুক্ত করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ১২ তারিখে মুক্তিযোদ্ধারা (প্রায় ৩০/৪০ জন) থানাকে ঘিরে ফেলেন। আক্রমণও করেন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে। এই লড়াইয়ে অংশ নেন শত শত মুক্তিযোদ্ধা। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানালে শত্রুসেনারা নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে থানা অভ্যন্তরে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এরপর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে যান। আলোচনাকালে শত্রুপক্ষ জীবনের নিরাপত্তা চাইলে তার নিশ্চয়তার প্রদান করে মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে নিয়ে এসে পাবনার সেনাশিবির ওয়াপদা কলোনিতে আটক করে রাখে।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১: পাবনা থেকে কিছু আর্মি বাস ও ট্রাকযোগে বগুড়া এবং ঢাকায় পালিয়ে যায়। কমান্ডার এম আই চৌধুরী ও শাহজাহানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা আটঘরিয়া থানা আক্রমণ করেন।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১: বেলা ১১টার দিকে পাবনা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে ভারতীয় বোমারু বিমান উড়তে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপর পর পর কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে। এতে ব্রিজের ১২ নং স্প্যানের পশ্চিম দিকের মাথা ভেঙে পানিতে পড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৯ ও ১৫ নং স্প্যানও। যখন ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকশী ব্রিজটির উপর বোমা নিক্ষেপ করছিল ঠিক তখনই পাকবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি ও একটি ট্যাংক ব্রিজের ওপর দিয়ে পার হচ্ছিলো। ১২ নং স্প্যানটি ভেঙে পড়ার পর ট্যাংকটি ব্রিজের ওপরেই পড়েছিল কয়েকজন পাকসেনার লাশ নিয়ে। সুজানগর থানা শত্রুমুক্ত হয়। এ দিন বেলা ২টার দিকে সুজানগর থানার তারাবাড়িয়া বাজারে পাবনা থেকে আগত পাকসেনা ও রাজাকারদের সাথে এক সম্মুখযুদ্ধে ১০ জন রাজাকার নিহত হয়। ঐ দিন পাকসেনারা আটঘরিয়ার কুষ্টিয়াপাড়া, চাঁদভা, সঞ্জয়পুর, অভিরামপুর প্রভৃতি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। পাকসেনাদের হাতে শহিদ হন ৮ নিরীহ গ্রামবাসী।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১: মুক্তিযোদ্ধারা পাবনা শহরে বিজয় পতাকা ওড়ান। জেলা স্কুল মাঠ থেকে শহরের বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে। হানাদার বাহিনী স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে পড়ে নূরপুর ওয়াপদা ক্যাম্পে।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১: ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্ন বিকেল ৪টা ২১ মিনিটে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড প্রধান আমির আব্দুল্লাহ নিয়াজির নেতৃত্বে নিঃশর্তভাবে পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে যৌথবাহিনীর কাছে।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন পাবনা বেড়া থানার ভারেঙ্গা গ্রামের সন্তান মুক্তিবাহিনীর উপ-সেনা প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো ছিলেন এস ফোর্স অধিনায়ক লে. কর্নেল কে এম সফিউল্লাহ, ২ নং সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এ টি এম হায়দার এবং টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর (কাদেরিয়া বাহিনী) অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী। সমগ্র বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। বাঙালি জাতি অর্জন করে স্বাধীনতা। এরপর থেকে প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের দিন স্মরণে রেখে বাঙালি জাতি উদযাপন করে তার সবচেয়ে গর্বের দিন 'বিজয় দিবস'।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সারা বাংলাদেশ মুক্ত হলেও পাবনা জেলা শত্রুমুক্ত হয় এর দুদিন পরে।

১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী চতুর্দিক থেকে পাবনা শহর ঘিরে ফেলে। আক্রমণ চালায় পাক-হানাদার বাহিনীর ওপর। অন্যদিকে ঢাকায় পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের খবর পেয়ে সাঁথিয়ার মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রজনতা ও সর্বস্তরের মানুষ বিজয় মিছিল করেন। ঐ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ইকবাল হোসেন, রফিকুল ইসলাম বকুল, আওরঙ্গজেব বাবলু, বেবী ইসলাম, আব্দুল বাতেন, নজরুল ইসলাম নান্নুসহ সাঁথিয়ার মুক্তিযোদ্ধাগণ।

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১: ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক কোম্পানি সৈন্য মেজর কে কে কোলির নেতৃত্বে পাবনা এসে পৌঁছে। তারা সার্কিট হাউজ, নূরপুর ডাকবাংলো ও বিসিক এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে। এদিন চাটমোহর থানা চূড়ান্তভাবে শত্রু মুক্ত হয়।

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১: সকাল ৮টায় ভারতীয় বাহিনী পাকসেনাদের নিরস্ত্রীকরণ করে ওয়াপদা ক্যাম্পে বন্দি করে রাখে। ১৯৭১ সালের এই দিনে কালেক্টরেট ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এদিন পুরাতন পলিটেকনিক স্কুলের নিকট পাকবাহিনী ও নকশালদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। বেবী ইসলাম সাক্ষাৎকারে বলেন : '১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও পাবনায় তারা সেদিন আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। তারা ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। জেনেভা কনভেনশন অনুসারে আত্মসমর্পণকারী পাকবাহিনীর দৈহিক নিরাপত্তা ব্যাহত হতে পারে এই আশঙ্কায় তারা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর দুই দিন পর অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, মিত্রবাহিনীর অফিসার ক্যাপ্টেন নন্দার উপস্থিতিতে ওয়াপদা কলোনিতে (নূরপুর) পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে। এর আগে জেলার সকল ঘাঁটি থেকে তারা ওয়াপদা কলোনিতে এসে সমবেত হয়।'

২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১: দুপুর থেকে পাকিস্তানি আর্মিদের আর্মি ভ্যাসে করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের গায়ে ড্রেস ছিল না। শুধু প্যান্ট ও গেঞ্জি পরে তারা আর্মি ভ্যানে ওঠে। অনেকে তাদের গায়ে থুথু দিতে থাকে। এদিকে চাটমোহরে কিছু সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। পরে নেতৃত্বস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধার সেখানে গিয়ে মিলিশিয়া বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিয়ে এনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেন। ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঈশ্বরদীতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে বহু পাকিস্তানি সৈন্য।

পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করতে অনেকেই অবদান রেখেছেন। এঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার বীর উত্তম, আমজাদ হোসেন এমএনএ, আবদুর রব বগা মিয়া, শহিদ এডভোকেট আমিনুদ্দিন এমপিএ, আমিনুল ইসলাম বাদশা, আহমেদ তফিজ উদ্দিন এমপিএ, মহিউদ্দিন আহমেদ এমপিএ, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ এমপিএ, মোজাম্মেল হক সমাজী, এডভোকেট গোলাম হাসনায়েন এম পি এ, রণেশ মৈত্র, ওয়াজি উদ্দিন খান, রফিকুল ইসলাম বকুল, বেবী ইসলাম, ইকবাল হোসেন, আব্দুস সাত্তার লালু, এডভোকেট আমজাদ হোসেন, রবিউল ইসলাম রবি, জহুরুল ইসলাম বিশু, প্রসাদ রায়, শামসুর রহমান শরিফ ডিলু, সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, হাবিবুর রহমান হাবিব, নিজাম উদ্দিন, লোকমান হোসেন, আবদুল লতিফসহ অগণিত মানুষ।

বিভিন্নভাবে পাবনার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় রেখেছেন অনন্য অবদান। কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, কেউ খাবার সরবরাহ করেছেন; কেউ আবার নানাস্থানে পাকসেনা ও তাদের দোসরদের আস্তানার সন্ধান দিয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি পাবনার নারীরাও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। কোনো কোনো নারী পুরুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় শিরীন বানু মিতিল ও ভানু নেছার কথা। শিরীন বানু মিতিল ভারতের করিমপুর ক্যাম্পে ট্রেনিং গ্রহণ করে যুদ্ধে অংশ নেন আর ভানু নেছা সাঁথিয়ার জোড়গাছা ব্রিজের যুদ্ধে অংশ নেন। মূলত ভানুনেছার বিচক্ষণতার কারণেই সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি

সৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেও পাবনায় পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে ১৮ ডিসেম্বর। দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে পাবনার মানুষ দেশমাতৃকার স্বাধীনতায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাবনার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ জীবন দিয়েছেন বলে জহুরুল ইসলাম বিশু 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১ সালে পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে এবং স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিসংগ্রামে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সুশিক্ষিত একটি পেশাদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামান্য অস্ত্র হাতে অসীম সাহসে বাঙালি মুক্তিসেনারা সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। অসম এই যুদ্ধে বাঙালির ত্যাগ এবং সাহস, একাগ্রতা এবং একাত্মতার কাছে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।

নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই বিজয় অর্জনে আমাদের হারাতে হয়েছে লাখো প্রাণ। দেশের স্বাধীনতা এবং মানুষের মুক্তির সংগ্রামে অকাতরে হাসিমুখে সেদিন বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন বীরমুক্তিসেনারা। নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের বিভিন্ন সময়ে পাবনা অঞ্চলে শহিদ হয়েছেন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা। সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজনের পরিচয় এবং বীরত্বগাঁথা-

শহীদ অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন

জন্ম ১৯২১ সালে নাটরের লালপুর উপজেলার গৌরীপুরে। পিতার নাম মৌলভী হারুনুর রশিদ। তিনি খঞ্জনপুর মিশন স্কুল থেকে ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৪০ সালে আইএ এবং ১৯৪২ সালে বিএ পাস করেন। বিএল প্রথম পর্ব পড়াশোনা করেন কলকাতায়। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। পড়ালেখা শেষ করে আইন পেশায় যুক্ত হন এবং পাবনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে। ১৯৬৭ সালে পাবনার ভুট্টা আন্দোলনের সময় ৯ মাস বিশেষ নিরাপত্তা আইনে কারাভোগ করেন। তিনি ১৯৭০ সালে পাবনা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হন। একই বছর পাবনা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তিনি ঈশ্বরদী ও আটঘরিয়া এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকসেনারা তাঁকে বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং ২৯ মার্চ নিষ্ঠুর নির্যাতনের পরে পাবনা বিসিক শিল্প নগরীতে গুলি করে হত্যা করে।

শহীদ গোলাম সরওয়ার খান সাধন

জন্ম ১৯৪৯ সালে, পৈতৃক নিবাস পাবনা শহরের রাধানগর। পিতা আব্দুল হামিদ খান, মাতা সুফিয়া খানম। তিনি ১৯৬৫ সালে আরএম একাডেমী থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে আইএসসি এবং ১৯৬৯ সালে বিএসসি পাস করেন। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি-তে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে আমোদ-প্রমোদ সম্পাদক ও ছাত্রলীগ পাবনা জেলা শাখার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। সামরিক প্রশিক্ষণ নেন ভারতের দেরাদুনে এবং দেশে এসে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এক নৈশ অভিযান শেষে ক্লান্ত হয়ে সুজানগর উপজেলার সারিয়াকান্দি গ্রামের এক বাড়িতে বিশ্রামরত ছিলেন। ভোরের দিকে রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। চার সহযোদ্ধাসহ তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় নগরবাড়ি সেনা ছাউনিতে। সেখানে নিয়ে চালানো হয় নিষ্ঠুর নির্যাতন। ১০ সেপ্টেম্বর বেয়নেট দিয়ে তাঁর চোখ তুলে পেটে বেয়নেট বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এরপর লাশ যমুনা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

শহীদ নজরুল ইসলাম চাঁদু

১৯৭১ সালে ৯ নভেম্বর পাবনার ফরিদপুর থানার কালিয়ান যুদ্ধে শহিদ হন। তাঁর জন্ম ধোপাদহ ইউনিয়নের কাশিয়াবাড়ি গ্রামে। পিতা খোরশেদ আলম, মাতা রমেছা খাতুন। দেশমাতৃকার টানে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র অবস্থায়ই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন। এই বীর শহীদ দয়ারামপুর নামক স্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

শহীদ আনোয়ার হোসেন মিন্টু

১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর কালিয়ান যুদ্ধে শহিদ হন। জন্ম সাঁথিয়া উপজেলার নাগডেমরা ইউনিয়নের পাটগাড়ী গ্রামে। পিতার নাম মোঃ আব্দুল হামিদ। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তিনি সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন। নিজ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে এই বীর সেনানী ঘুমিয়ে আছেন।

শহীদ গোলাম মোস্তফা টসর

১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর কালিয়ান যুদ্ধে শহীদ হন। জন্ম সাঁথিয়া থানার নাগডেমরা গ্রামে। পিতার নাম রোস্তম খান লোদি। নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। পাকসেনাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শহিদ আব্দুস সবুর

জন্ম সাঁথিয়া উপজেলার নাগডেমরা গ্রামে। পিতা আব্দুর রাজ্জাক। ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর ফরিদপুরের কালিয়ান যুদ্ধে শহিদ হন। তিনি পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন। পারিবারিক কবরস্থানে এই সূর্যসন্তান ঘুমিয়ে আছেন।

শহীদ আব্দুল আউয়াল

জন্ম সাঁথিয়ার ধুলাউড়ি ইউনিয়নের এন মনোহরগাঁতি (বারোয়ানি) গ্রামে। পিতা ছমির উদ্দিন প্রামাণিক। শিক্ষাগত যোগ্যতা ২য় শ্রেণি। তিনিও কালিয়ান নামক স্থানে পাকসেনাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শহীদ মজিবর রহমান

জন্ম সাঁথিয়া থানার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়নের বানিয়াবহু গ্রামে। পিতা মোঃ আছির উদ্দিন ফকির। তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর, পাবনার ফরিদপুর থানার কালিয়ান যুদ্ধে তিনি শহিদ হন। তিনিও সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন। নিজ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

শহীদ মোকছেদ আলী

জন্ম সাঁথিয়া উপজেলার আর-আতাইকুলা ইউনিয়নের বামনডাঙ্গা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম দারোগ আলী। তিনি নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর সাঁথিয়া থানার ধুলাউড়ি গ্রামে পাকবাহিনীর নরপশুদের গুলিতে শহিদ হন। ধুলাউড়ি গণকবরে এই দামাল সন্তান ঘুমিয়ে আছেন।

শহীদ আক্তার হোসেন

জন্ম সাঁথিয়া উপজেলার আর-আতাইকুলা ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম আলিমুদ্দিন। তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর সাঁথিয়া থানার ধুলাউড়ি গ্রামে পাকবাহিনীর নরপশুদের গুলিতে শহীদ হন। জাতির এই তেজোদীপ্ত সন্তান ধুলাউড়ি গণকবরে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

শহীদ চাঁদ আলী বিশ্বাস

জন্ম সাঁথিয়া উপজেলার আর-আতাইকুলা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে। পিতার নাম রিয়াজ উদ্দিন বিশ্বাস। তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর সাঁথিয়া থানার ধুলাউড়ি গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে শহীদ হন। ধুলাউড়ি গণকবরে তিনি ঘুমিয়ে আছেন।

শহীদ দারা মিয়া

জন্ম সাঁথিয়া উপজেলার আর-আতাইকুলা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে। পিতার নাম আবুল হোসেন। তিনি এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর সাঁথিয়া থানার ধুলাউড়ি গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে শহীদ হন। ধুলাউড়ি গণকবরে তিনি ঘুমিয়ে আছেন।

শহীদ মহসিন মধু

জন্ম সাঁথিয়া উপজেলার আর-আতাইকুলা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে। পিতা আব্দুল গফুর শেখ। তিনি এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর সাঁথিয়া থানার ধুলাউড়ি গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে শহীদ হন। ধুলাউড়ি গণকবরে তিনি ঘুমিয়ে আছেন।

শহীদ খবির উদ্দিন বিশ্বাস

জন্ম সাঁথিয়া উপজেলার আর-আতাইকুলা ইউনিয়নের পদ্মবিলা গ্রামে। পিতা ঝড়ু বিশ্বাস। তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর সাঁথিয়া থানার ধুলাউড়ি গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে শহীদ হন। ধুলাউড়ি গণকবরে তিনি ঘুমিয়ে আছেন।

শহীদ আল্লা-রাখ্‌খা খান

জন্ম পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোটে। ভাগ্যচক্রে চলে আসেন পূর্ব পাকিস্তানে এবং পাবনা শহরের গুরু ট্রেনিং (পিটিআই) স্কুলের পাশে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন একজন সৈনিক। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১২-শ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অধীনে বার্মা ফ্রন্টের যুদ্ধে যোগদান করেন। ঐ যুদ্ধে তিনি আহত হন। বীরত্বের জন্য সাধারণ সৈনিক থেকে ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে তিনি বার্মার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। সেনাবাহিনীর চাকুরি ছেড়ে পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। এরপর এক বাঙালি নারীকে বিয়ে করে এদেশেই বসবাস করতে থাকেন। পুত্র পরিজন নিয়ে সুখেই ছিলেন।

১৯৭১ সালের একজন পাকিস্তানি হয়েও তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। পুত্রকে সাথে নিয়ে নিয়ে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। পাবনা শহরে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বের যুদ্ধ ছাড়াও পাবনা-নগরবাড়ির বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন। পরে পাকসেনাদের চতুর্মুখী আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে আল্লা-রাখ্‌খা খান ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হন, কিন্তু ইপিআর সদস্যদের সন্দেহের কারণে যেতে পারেন নি। উপায়ান্তর না দেখে পদ্মাতীরের একটি গ্রামে আশ্রয় নেন, সেখানে কারও আস্থা না পেয়ে পাবনায় নিজগৃহে ফিরে আসেন। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার খবর যথাসময়ে পাকবাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয় শান্তিকমিটির লোকেরা। এরপর আল্লা-রাখ্‌খা খান ও তাঁর ছেলেকে পাবনা সার্কিট হাউসের টর্চার সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২৩ মে অন্যান্য বাঙালি বন্দি ও সাথে তাঁকে টেবুনিয়া বীজভাণ্ডার চত্বরে গুলি করে হত্যা করা হয়।

শহীদদের তালিকা

১. অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন, পিতা আলহাজ্ব হারুন-আর-রশিদ মোল্লা, গোপালপুর, পাবনা;
২. মওলানা কছিম উদ্দিন আহম্মেদ, পিতা মহির উদ্দিন সরকার, গোপালপুর, পাবনা;
৩. আবু সাঈদ তালুকদার, পিতা জোনাব আলী তালুকদার, তৃপ্তি নিলয়, রাধানগর, পাবনা;
৪. আবদুস সোবাহান চেয়ারম্যান, পিতা আলহাজ শেখ দিয়ানত আলী, মহেন্দ্রপুর, পাবনা;

৫. আবদুর রাজ্জাক রিদ্দিক, পিতা আব্দুল আজিজ প্রামাণিক, গোপালপুর, পাবনা;
৬. জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম, পিতা আবদুল গনি, রাঘবপুর, পাবনা;
৭. নূরুল ইসলাম নূর, পিতা কফিল উদ্দিন, শিবরামপুর, পাবনা;
৮. শেখ কোবাদ আলী, পিতা শেখ করিম বক্স, সাধুপাড়া, পাবনা;
৯. রবিউল ইসলাম রবি, পিতা নূরু শেখ, গোবিন্দা, পাবনা;
১০. ফজলুল হক, পিতা হাজী আহম্মদ প্রামাণিক, মোজাহিদ ক্লাব, পাবনা;
১১. হাফিজুর রহমান, পিতা ডা. আবদুর রহমান, নারায়ণপুর, পাবনা;
১২. মোস্তাক হোসেন, পিতা মোতাহার হোসেন, সাধুপাড়া, পাবনা;
১৩. ইসমাইল হোসেন গামা, পিতা মো. আবু তালেব, জেলাপাড়া, পাবনা;
১৪. ডা. অমলেন্দু কুমার দাক্ষী, পিতা পার্বতী চরণ দাক্ষী, ট্রাফিক মোড়, পাবনা;
১৫. মোসলেম উদ্দিন, পিতা ইয়াদ আলী প্রামাণিক, তারাবাড়িয়া, পাবনা;
১৬. শাহজাহান আলী, পিতা জাবেদ আলী শেখ, সুকচর, চরতারাপুর, পাবনা;
১৭. মোশাররফ হোসেন রঞ্জু, পিতা মোতাহার হোসেন, সাধুপাড়া, পাবনা;
১৮. ইউসুফ হোসেন, পিতা মোতাহার হোসেন, সাধুপাড়া, পাবনা;
১৯. আমির হোসেন, পিতা আসাদ আলী বিশ্বাস, ভাঁড়ারা, পাবনা;
২০. আবতাব উদ্দিন মালিথা, পিতা ডা. বাহার উদ্দিন, হেমায়েতপুর, পাবনা;
২১. আবদুল হামিদ, পিতা হাছেন আলী, আটুয়া, পাবনা;
২২. মোকাররম হোসেন, পিতা মোতাহার হোসেন, সাধুপাড়া, পাবনা;
২৩. মনছুর হোসেন, পিতা মোতাহার হোসেন, সাধুপাড়া, পাবনা;
২৪. ডা. ফজলে রাব্বি, কুঠিপাড়া, পাবনা;
২৫. মহরম হোসেন, পিতা ইয়াজ উদ্দিন শেখ, রাধানগর, পাবনা;
২৬. সোনাউল্লা খান, পিতা বেলায়েত আলী খান, টিকরী, পাবানা;
২৬. রাব্বেল আলী সরদার, পিতা রহমান সরদার, নাজিরপুর, পাবনা;
২৭. গোলাম সরোয়ার খান সাধন, পিতা আবদুল হামিদ খান, শালগাড়িয়া, পাবনা;
২৮. আলমগীর কবির স্বপন, পিতা আ. গনি, রাঘবপুর, পাবনা;
২৯. সুলতান মাহমুদ আলমগীর, পিতা মো. কছির জোয়ারদার, নাজিরপুর, পাবনা;
৩০. জনাব আলী, পিতা বাসের প্রামাণিক, নাজিরপুর, পাবনা;
৩১. আবুল হাসেম, পিতা হাকিম উদ্দিন শেখ, কাচারীপাড়া, পাবনা;
৩২. আবদুল মান্নান, পিতা ইসমাইল হোসেন, গোপালপুর, পাবনা;
৩৩. ফিরোজ আলী প্রামাণিক, পিতা সেকেন্দার আলী প্রামাণিক, চকপৈলানপুর, পাবনা;
৩৪. নজরুল ইসলাম সাচ্চু, পিতা আগবর আলী মিয়া, দিলালপুর, পাবনা;
৩৫. গোলাম রাজ্জাক চৌধুরী সাফী, পিতা গোলাম কাদের চৌধুরী, দিলালপুর, পাবনা;
৩৬. আবু বক্কার সিদ্দিক, পিতা কেদার আলী প্রামাণিক, দ্বীপচর, পাবনা;
৩৭. আবদুস সাত্তার ছানা, পিতা আতাহার আলী, নাজিরপুর, পাবনা;
৩৮. মহিউদ্দিন হায়দার, পিতা সদর উদ্দিন আহমেদ, কাচারপাড়া, পাবনা;
৩৯. শাজাহান আলী ছানা, পিতা জাবেদ আলী শেখ, চর তারাপুর, পাবনা;
৪০. ডা. আমিরুল ইসলাম, পিতা আজিম উদ্দিন মিয়া, লস্করপুর, পাবনা;
৪১. আবদুল বারিক, পিতা রিয়াজ আলী শেখ, রাধানগর, পাবনা;
৪২. শাহজাহান আলী, পিতা ডা. বাহার উদ্দিন, সানিকদিয়ার, পাবনা;
৪৩. আবুল মহসিন বেগ মুকু, পিতা ডা. আলিমুদ্দিন আহমেদ, আতাইকুলা রোড, পাবনা;
৪৪. মোহাম্মদ আলী বাবুল, পিতা সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, কাচারীপাড়া,পাবনা;
৪৫. শেখ আনোয়ার হোসেন, পিতা শেখ মকবুল হোসেন, লস্করপুর, পাবনা;
৪৬. আবুল হোসেন, পিতা মওলা বকস খান, আটুয়া, পাবনা;
৪৭. আল্লা-রাখ্খা খান, পিতা মওলা বকস খান, আটুয়া, পাবনা;
৪৮. আকমল হোসেন আলো, পিতা আ. গনি প্রামাণিক, চকপৈলানপুর, পাবনা;

৪৯. আশরাফুজ্জামান শেখ, পিতা মকবুল হোসেন, গোবিন্দা, পাবনা;
৫০. আবদুল কুদ্দুস, পিতা ইয়াদ আলী বিশ্বাস, চরতারাপুর, পাবনা;
৫১. মতিয়ার রহমান মতি, পিতা শফিউদ্দিন সরকার, বকুলের গলি, গোপালপুর, পাবনা; স্থায়ী ঠিকানা খাস-সাতবাড়িয়া, থানা শাহজাদপুর, জেলা সিরাজগঞ্জ;
৫২. লিয়াকত আলী, পিতা মো. জনাব আলী, টিকরী, পাবনা;
৫৩. তৌহিদ খান, পিতা মাদারন মিঞা, দক্ষিণ রাঘবপুর, পাবনা;
৫৪. নওয়াব আলী মণ্ডল, পিতা গকুল উদ্দিন মণ্ডল, সাহাপুর, ঈশ্বরদী;
৫৫. ইকবাল কাশেম, পিতা আবুল কাসেম, রহিমপুর, ঈশ্বরদী;
৫৬. নূর মোহাম্মদ, পিতা মোহাম্মদ আলী, টেংরী, ঈশ্বরদী;
৫৭. নায়েব আলী প্রামাণিক, পিতা জাফর আলী প্রামাণিক, মহাদেবপুর, ঈশ্বরদী;
৫৮. মনসুর আলী, পিতা ইছাক আলী, গ্রাম তিলকপুর, ঈশ্বরদী;
৫৯. মুকতল হোসেন, পিতা মীর শাহাদত হোসেন, মহাদেবপুর, ঈশ্বরদী;
৬০. সৈয়দ আবু ইলিয়াছ, পিতা ইয়াকুব আলী, সাহাপুর, ঈশ্বরদী;
৬১. আফিল উদ্দিন, পিতা জাফর আলী বিশ্বাস, জয়নগর, ঈশ্বরদী;
৬২. নূরুল ইসলাম, পিতা নবীর উদ্দিন, চররূপপুর, ঈশ্বরদী;
৬৩. শহিদুল ইসলাম, পিতা তৈয়ব আলী মন্ডল, দাদাপুর, ঈশ্বরদী;
৬৪. আবদুর রশিদ, পিতা রহমত আলী প্রামাণিক, বিলকেদার, ঈশ্বরদী;
৬৫. ইউনুছ আলী, পিতা খেরু প্রামাণিক, মুলাডুলি, ঈশ্বরদী;
৬৬. আবদুল গফুর, পিতা খোরশেদ আলী, পাকশী, ঈশ্বরদী;
৬৭. আবদুর রাজ্জাক, পিতা আজাহার আলী বিশ্বাস, নতুন রূপপুর, ঈশ্বরদী;
৬৮. আবদুর রাজ্জাক, পিতা আমির উদ্দিন, গ্রাম বিলকেদার, ঈশ্বরদী;
৬৯. ইসরাইল হোসেন, পিতা মোজাহার আলী, ঈশ্বরদী;
৭০. আবদুস সাত্তার, পিতা আবদুর রহমান বিশ্বাস, গ্রাম নতুন রূপপুর, পাকশী, ঈশ্বরদী;
৭১. শেলী মোস্তফা, পিতা আবদুর রহমান মোল্লা, আড়মবাড়িয়া, ঈশ্বরদী;
৭২. হাবিবুর রহমান, পিতা আবদুর রহিম, নতুন রূপপুর, ঈশ্বরদী;
৭৩. আবদুল আজিজ, পিতা হারেজ উদ্দিন, পাকশী, ঈশ্বরদী;
৭৪. নুরুল ইসলাম, পিতা নবীর উদ্দিন, চররূপপুর, ঈশ্বরদী;
৭৫. আবদুল মালেক, পিতা মফিজ উদ্দিন খাঁ, গ্রাম চররূপপুর, পাকশী, ঈশ্বরদী;
৭৬. আফতাব হোসেন, পিতা গকুল উদ্দিন, সাহাপুর, ঈশ্বরদী;
৭৭. আলীবুর রহমান, পিতা মো. ইউছুপ আলী প্রামাণিক, দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী;
৭৮. আবদুর রহমান, পিতা ইসমাইল হোসেন, দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী;
৭৯. নায়েব আলী, পিতা মোজাফ্ফর আলী, লক্ষ্মীকুণ্ডা, ঈশ্বরদী;
৮০. আবদুল মান্নান, পিতা আবদুস সাত্তার মন্ডল, পাকশী, ঈশ্বরদী;
৮১. আবদুর রব, পিতা আবদুস সাত্তার, ঈশ্বরদী;
৮২. আফিল উদ্দিন, পিতা জাফর আলী বিশ্বাস, ছলিমপুর, ঈশ্বরদী;
৮৩. আবদুল রহিম, পিতা মো. আফাজ উদ্দিন, ছলিমপুর, ঈশ্বরদী;
৮৪. আলী আহমেদ সরকার, পিতা তাহের আলী সরকার, সাহাপুর, ঈশ্বরদী;
৮৫. আবদুল আজিজ পিতা শেখ মেহের উল্লাহ, সাহাপুর, ঈশ্বরদী;
৮৬. ওহিদুর রহমান, পিতা দিনাজ উদ্দিন, সাহাপুর, ঈশ্বরদী;
৮৭. আবদুল খালেক, পিতা জুরান উদ্দিন সরকার, বৃশালিখা, বেড়া;
৮৮. নাজিম উদ্দিন, পিতা মো. হেকমত আলী মোল্লা বনগ্রাম, বেড়া;
৮৯. মোশাররফ হোসেন, পিতা খন্দকার বেলায়েত হোসেন, নাটিয়াবাড়ি, বেড়া;
৯০. আবদুস সাত্তার, পিতা শের আলী শেখ, বেড়া দক্ষিণপাড়া, বেড়া;
৯১. রইস উদ্দিন সিকদার, পিতা রিয়াজ উদ্দিন সিকদার, কালিকাবাড়ি, বেড়া;
৯২. নাজিম উদ্দিন মিয়া, পিতা মো. আবদুল বাছেদ মিয়া, খানপুর বাজার, বেড়া;

৯৩. আবদুর রশিদ মোল্লা, পিতা বাহাদুর মোল্লা, শীতলপুর, বেড়া;
৯৪. আবদুর রশিদ খান, পিতা ময়েজ উদ্দিন খান, ২নং রূপপুর, বেড়া;
৯৫. নুরুল হোসেন, পিতা আবদুর রহমান মিয়া, নাটিয়াবাড়ি, বেড়া;
৯৬. নাজিম উদ্দিন, পিতা আফতাব উদ্দিন চৌধুরী, মাসুমদিয়া, বেড়া;
৯৭. জাফর আলী, পিতা তাজুল শেখ, রূপপুর, বেড়া;
৯৮. জয়ন্তর বিশ্বাস, পিতা ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস, বনগ্রাম, বেড়া;
৯৯. মীর মফতুল হোসেন, পিতা মীর শাহাদৎ হোসেন, মহাদেবপুর, পাকুরিয়া, চাটমোহর;
১০০. আবদুস সাত্তার (আনসার), পিতা জয়েন উদ্দিন খান, নিমাইচড়া, চাটমোহর;
১০১. মোহাম্মদ আলী (আনসার), পিতা মেছের পণ্ডিত, নিমাইচড়া, চাটমোহর;
১০২. আবু তারেব, পিতা মেহের উদ্দিন মোল্লা, চাটমোহর;
১০৩. অজিৎ কুমার দে, পিতা হারান চন্দ্র দে, গুনাইগাছা, চাটমোহর;
১০৪. গোবিন্দ চন্দ্র দে, পিতা শধীরচন্দ্র দে, গুনাইগাছা, চাটমোহর;
১০৫. রবীন্দ্রনাথ গোস্বামী, পিতা ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, গুনাইগাছা, চাটমোহর;
১০৬. অনিল গোমেজ, পিতা বেচুমিন গোমেজ, মথুরাপুর, চাটমোহর;
১০৭. মোসলেম উদ্দিন, পিতা মেহের উদ্দিন মোল্লা, বনগ্রাম, চাটমোহর;
১০৮. ইব্রাহিম মোল্লা কামাল দুলাল, পিতা ডা. এএম সলিম উল্লাহ, ভবানীপুর, সুজানগর;
১০৯. শামসুল আলম বুলবুল, পিতা আবদুস শুকুর মিয়া, ভাটিকয়া, রানীনগর, সুজানগর আবদুর রহমান, পিতা আহাম্মদ আলী শেখ, চরদুলাই, সুজানগর;
১১০. সর্দার আনছার উদ্দিন, পিতা সর্দার গহর উদ্দিন, কাদুয়া, সুজানগর;
১১১. মুসলিম উদ্দিন প্রামাণিক, পিতা এরাদ আলী প্রামাণিক, তারাবাড়িয়া, সুজানগর;
১১২. ছাদেক আলী মোল্লা, পিতা কাদির মোল্লা, রাইশিমুল, সুজানগর;
১১৩. মাজেদুর রহমান, পিতা জিন্দার আলী, মানিকহাট, সুজানগর;
১১৪. আবদুল আওয়াল, পিতা মোকছেদ আলী বিশ্বাস, মসজিদপাড়া, সুজানগর;
১১৫. মোহাম্মদ দারা, পিতা আবুল হোসেন, তাঁতিবন্দ, সুজানগর;
১১৬. আমজাদ হোসেন, পিতা ছকির উদ্দিন প্রামাণিক, ছেচনিয়া, সাঁথিয়া;
১১৭. মোকছেদ আলী, পিতা দারোগ আলী, আর-আতাইকুলা, সাঁথিয়া;
১১৮. খবির উদ্দিন বিশ্বাস, পিতা বাবু বিশ্বাস, আর-আতাইকুলা, সাঁথিয়া;
১১৯. আক্তার আলম, পিতা আলিম উদ্দিন, আর-আতাইকুলা, সাঁথিয়া;
১২০. আবদুল আউয়াল, পিতা ছমির উদ্দিন প্রামাণিক, ধুলাউড়ি, সাঁথিয়া;
১২১. আনোয়ারুল ইসলাম মিন্টু, পিতা আবদুল মজিদ, নাগডেমরা, সাঁথিয়া;
১২২. চাঁদ আলী বিশ্বাস, পিতা মো. রিয়াজ উদ্দিন বিশ্বাস, আর-আতাইকুলা, সাঁথিয়া;
১২৩. মজিবর রহমান, পিতা অভির উদ্দিন ফকির, ক্ষেতুপাড়া, সাঁথিয়া;
১২৪. শিহাব উদ্দিন শেক, পিতা আলহাজ এসের উদ্দিন শেখ, আর-আতাইকুলা, সাঁথিয়া;
১২৫. নজরুল ইসলাম, পিতা মো. খেরশেদ আলম, ধোপাদহ, সাঁথিয়া;
১২৬. আবদুস সামাদ ছাত্তার, পিতা মো. সুফিয়া প্রামাণিক, ধোপাদহ, সাঁথিয়া;
১২৭. আবদুস সবুর, পিতা আবদুর রাজ্জাক সরদার, নাগডেমরা, সাঁথিয়া;
১২৮. মহসীন শেখ মধু, পিতা মো. আবদুল গফুর শেখ, আর-আতাইকুলা, সাঁথিয়া;
১২৯. সামছুর রহমান, পিতা মোহাম্মদ আলী শেখ, রঘুনাথপুর, সাঁথিয়া;
১৩০. গোলাম মোস্তফা, পিতা রোস্তম আলী খান লেদী, নাগডেমরা, সাঁথিয়া;
১৩১. দারা মিয়া, পিতা আবুল হোসেন, রঘুনাথপুর, আর-আতাইকুলা, সাঁথিয়া;
১৩২. তোয়াজ উদ্দিন, পিতা কলিম উদ্দিন খান, গ্রাম ত্রিমোহন, একদন্ত, আটঘরিয়া;
১৩৩. তোতা মিয়া, পিতা দেওয়ান আলী, চাঁদভা, আটঘরিয়া;
১৩৪. আবুল কাশেম, পিতা সাহের আলী, গ্রাম বেরুয়ান, চাঁদভা, আটঘরিয়া;
১৩৫. হায়দার আলী, পিতা মৃত বদর উদ্দিন, গ্রাম পাটেশ্বর, দেবোত্তর, আটঘরিয়া;
১৩৬. আবদুল খালেক, পিতা আলহাজ আবদুল হক শেখ, গ্রাম মাজপাড়া, আটঘরিয়া;

১৩৭. আবুল কালাম, পিতা ইসাক মোল্লা, বংশীপাড়া (কালামনগর), আটঘরিয়া;
১৩৮. ইসাক মোল্লা, বংশীপাড়া, আটঘরিয়া;
১৩৯. আবদুল মান্নান, বংশীপাড়া, আটঘরিয়া;
১৪০. আবদুল বারী, বংশীপাড়া, আটঘরিয়া;
১৪১. নূর আলী, বংশীপাড়া, আটঘরিয়া;
১৪২. আল আরশাদ, পিতা মকবুল হোসেন, বৃলাহিড়ীবাড়ি, ফরিদপুর;
১৪৩. আহসান উদ্দিন, পিতা আজিম উদ্দিন, ডেমরা, ফরিদপুর;
১৪৪. আকরাম হোসেন, পিতা আফাজ উদ্দিন, ডেমরা, ফরিদপুর;
১৪৫. ইউনুস আলী, পিতা আফাজ উদ্দিন, ডেমরা, ফরিদপুর;
১৪৬. পল্টু মোহন চৌধুরী, পিতা প্রফুল্ল মোহন চৌধুরী, গোপালপুর, পাবনা;
১৪৭. আসাব আলী প্রামাণিক, পিতা আবদুল আজিজ প্রামাণিক, গোপালপুর, পাবনা;
১৪৮. ইদ্রিস আলী প্রামাণিক, পিতা আবদুল আজিজ প্রামাণিক, গোপালপুর, পাবনা;
১৪৯. দুলাল, পিতা মুজিবুর রহমান, শালগাড়িয়া, পাবনা;
১৫০. সুবোধ কুমার দে (টিংকু), পিতা শান্তিচরণ দে, শালগাড়িয়া, পাবনা;
১৫১. আলেপ, পিতা জেহের আলী, রাধানগর, পাবনা;
১৫২. বুলগানী, পিতা ডা. আবদুর রহমান, জোতনারায়ণপুর, পাবনা;
১৫৩. মহসিন আলী, পিতা হারান আলী প্রামাণিক, গ্রাম চররূপপুর, ঈশ্বরদী;
১৫৪. আশরাফ আলী পতন, পিতা আবদুল আজিজ মিয়া, শিবরামপুর, পাবনা;
১৫৫. ফেরদৌসী বেগম ইতি, পিতা মমতাজ উদ্দিন, দিলালপুর, পাবনা;
১৫৬. ডা. আফাজ উদ্দিন, পিতা ছামেত আলী, গ্রাম সমাসনাড়ী, পাইকারহাটি, সাঁথিয়া;
১৫৭. খোয়াজ, পিতা ঝালু শিকদার, গ্রাম সমাসনাড়ী, পাইকারহাটি, সাঁথিয়া;
১৫৮. শহিদ জগৎ নারায়ণ বিশ্বাস, পিতা বসন্ত নারায়ণ বিশ্বাস, গ্রাম পাইকারহাটি, সাঁথিয়া;
১৫৯. আবদুল লতিফ বড় মিয়া, পিতা জমির উদ্দিন শেখ, গ্রাম পাইকারহাটি, সাঁথিয়া;
১৬০. কাজেম খাঁ, পিতা কবির খাঁ, গ্রাম পাইকারহাটি, সাঁথিয়া;
১৬১. মহর আলী মোল্লা, পিতা আতা মোল্লা, গ্রাম পাইকারহাটি, সাঁথিয়া;
১৬২. জাকের আলী শেক, পিতা জসিম উদ্দিন শেখ, গ্রাম পাইকারহাটি, সাঁথিয়া;
১৬৩. সন্তোষ মোল্লা, পিতা কুশাই মোল্লা, গ্রাম পাইকারহাটি, সাঁথিয়া;
১৬৪. শাহজাহান মিয়া বিএসসি, পিতা মোতাচ্ছেম মিয়া, গ্রাম সৈয়দপুর, সুজানগর;
১৬৫. পিয়ার মণ্ডল, পিতা খিয়াল মণ্ডল, গ্রাম পাইকারহাটি, সাঁথিয়া;
১৬৬. ফরিদা পারভীন, পিতা আবদুল বারী খান (ফকির খান), গ্রাম দত্তপাড়া, সাঁথিয়া;
১৬৭. হাবিলদার এমদাদ আলী, ইপিআর সদস্য, পাবনা, ডাববাগান যুদ্ধে শহীদ;
১৬৮. নায়েক মফিজ উদ্দিন, ইপিআর সদস্য, ঢাকা, ডাববাগান যুদ্ধে শহীদ;
১৬৯. নায়েক গোলাম পাঞ্জাতন, ইপিআর সদস্য, কুষ্টিয়া, ডাববাগান যুদ্ধে শহীদ;
১৭০. ল্যান্সনায়েক আতিয়ার রহমান, ইপিআর সদস্য, কুষ্টিয়া, ডাববাগান যুদ্ধে শহীদ;
১৭১. ল্যান্সনায়েক ছালেহ্ আহমেদ, ইপিআর সদস্য, নোয়াখালী, ডাববাগান যুদ্ধে শহীদ;
১৭২. সিপাহি নূর উদ্দিন, ইপিআর, বরিশাল, ডাববাগান যুদ্ধে শহীদ;
১৭৩. সিপাহি ইলিয়াছ, ইপিআর সদস্য, রাজশাহী, ডাববাগান যুদ্ধে শহিদ;
১৭৪. সিপাহি আবু হোসেন, ইপিআর সদস্য, রাজশাহী, ডাববাগান যুদ্ধে শহিদ;
১৭৫. সিপাহি গোলাম মোস্তফা, ইপিআর সদস্য, সিলেট, ডাববাগান যুদ্ধে শহিদ;
১৭৬. সিপাহি রফিকুল ইসলাম, ইপিআর সদস্য, রাজশাহী, ডাববাগান যুদ্ধে শহিদ;
১৭৭. সিপাহি রমজান আলী, ইপিআর সদস্য, যশোর, ডাববাগান যুদ্ধে শহিদ;
১৭৮. আশরাফ আলী (আক্কেল), পিতা আহেদ আলী, জিলাপাড়া, পাবনা;
১৭৯. আকবর আলী, পিতা ঝরু খাঁ, জিলাপাড়া, পাবনা;
১৮০. আফছার আলী, পিতা শেখ মেছের আলী, জিলাপাড়া, পাবনা;
১৮১. মোশারফ হোসেন (মুশা), পিতা আলতাফ হোসেন, জিলাপাড়া, পাবনা;

১৮২. শফিউদ্দিন অ্যাডভোকেট, পিতা জয়নাল আবেদীন, পাবনা;
১৮৩. নূরুল হক, জিলাপাড়া, পাবনা;
১৮৪. শফিউন্নবী সূর্য, পিতা সোহরাব আলী, পাবনা;
১৮৫. হারুনর রশিদ, পাবনা;
১৮৬. বিভূতিভূষণ সাহা, পিতা ডা. বিহারী লাল সাহা, জিলাপাড়া, পাবনা;
১৮৭. এসআই মির্জা হাবিবুর রহমান বেগ (হবি), পিতা আলহাজ মির্জা তফিয়ৎ বেগ, বাবুপাড়া, শহিদ তিতুমীর সড়ক, পোস্ট, থানা ও জেলা নীলফামারী, তৎকালীন পাবনা পুলিশের ডিআইও-১;
১৮৮. আবুল বরকত, তৎকালীন পাবনা জেলা আনসার অ্যাডজুট্যান্ট;
১৮৯. হাবিলদার-২০ মো. ইসরাইল হক, পিতা মুন্সি ফজর আলী, বড়কাজলী, নগরকান্দা, ফরিদপুর, পুলিশ লাইন, পাবনা;
১৯০. কনস্টেবল-১৯৭ মো. শেখ রহিম উদ্দিন, পিতা রমজান আলী, জেলাপাড়া, গোপালপুর, পাবনা, পুলিশ লাইন, পাবনা;
১৯১. কনস্টেবল-২০৩ মো. হুজ্জত আলী, পিতা আবদুল মজিদ, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ, পুলিশ লাইন, পাবনা;
১৯২. কনস্টেবল-২১১ মো. আশরাফ আলী, পিতা সেলিম শেখ, গোয়ালকান্দি, ময়মনসিংহ, পুলিশ লাইন, পাবনা;
১৯৩. কনস্টেবল-২৪৩ মেনহাজ উদ্দিন, পিতা জয়নাল আবেদীন, নাটোর, পুলিশ লাইন, পাবনা;
১৯৪. এসআই মো. আলী আজম ভূঁইয়া, পিতা আলী আজগর, গ্রাম চান্দি, থানা ও জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পুলিশ লাইন, পাবনা;
১৯৫. হাবিলদার-১১১ মো. সিরাজুল ইসলাম সিদ্দিক, পিতা ইসাহাক সিদ্দিকী, মাইলজারী, নাগরপুর, টাঙ্গাইল, পুলিশ লাইন, পাবনা;
১৯৬. কনস্টেবল-২৬৯ মো. হোসেন আলী, পিতা জয়েন উদ্দিন ভুঁইয়া, জেলা ও থানা ফরিদপুর, পুলিশ লাইন পাবনা;
১৯৭. কনস্টেবল-৩৭৭ মো. মোসলেম উদ্দিন, পিতা পরেশ উল্লাহ শেখ, বগুড়া, পুলিশ লাইন, পাবনা;
১৯৮. কনস্টেবল-৩৪৪ মো. আবদুস সামাদ, পুলিশ লাইন পাবনা;
১৯৯. কনস্টেবল-৩৮০ মো. ইমান আলী মোল্লা, পিতা মৃত সদু মোল্লা, কাচারীপাড়া, পাবনা, পুলিশ লাইন পাবনা;
২০০. হাবিলদার-৬৪২ মো. রজব আলী, পিতা মৃত বাচ্চু দেওয়ান, নোয়াদা, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ, পুলিশ লাইন পাবনা;
২০১. কনস্টেবল-৩৯৬ মো. লালু খান, পিতা হাসেন উদ্দিন খান, কমলাপুর, জেলা ফরিদপুর, পুলিশ লাইন পাবনা;
২০২. কনস্টেবল-৭৭৮ মো. ফয়েজ উদ্দিন, পিতা সামাদ উদ্দিন, ভাজনডাঙ্গা, ফরিদপুর, পুলিশ লাইন, পাবনা;
২০৩. নায়েক-১৪৬ মো. আব্বাস আলী, পিতা আবদুস সোবাহান মিয়া, কাচারীপাড়া, গোপালপুর, পাবনা, পুলিশ লাইন পাবনা;
২০৪. কনস্টেবল-৩৩৯ মো. আবুল কাশেম, পিতা নজর আলী খান, মটবাড়িয়া, পিরোজপুর, পুলিশ লাইন পাবনা;

(অসম্পূর্ণ)

খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বীর মুক্তিসেনাদের বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করে। সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পদক–বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, বীর উত্তম ৬৮ জন, বীর বিক্রম ১৭৫ জন এবং ৪২৬ জনকে সরকার বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের গেজেট প্রকাশ করে। গেজেট অনুযায়ী পাবনা জেলার খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা:

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার (বীর উত্তম)

জন্ম ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি পাবনা জেলার বেড়া থানায়। পিতা খন্দকার আব্দুল লতিফ, মাতা আরেফা খাতুন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি উপ-প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকারে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হন। শেষজীবনে '১৯৭১: ভেতওে বাইরে' বই লিখে বিতর্কের জন্ম দেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বীর উত্তম খেতাব পেয়েছিলেন।

সহায়কপঞ্জি

আবুল কালাম আজাদ : মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা পাবনা জেলা, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১)

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
সম্পাদিত : মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯)
আবুল হোসেন খোকন : জনযুদ্ধের দিনগুলি, (ঢাকা: জাগৃতি, ২০১২)
এডভোকেট আমজাদ হোসেন : বিস্মৃত প্রায়, (পাবনা: ২০০৬)
এম. আবদুল আলীম : পাবনার ইতিহাস (ঢাকা: গতিধারা, ২০১২)
: পাবনায় ভাষা আন্দোলন (ঢাকা: রোদেলা, ২০১৩)
: মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস: পাবনা (ঢাকা: তাম্রলিপি প্রকাশনী, ২০১৭)
: ভাষা-আন্দোলন-কোষ, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০২০)
কামাল আহমেদ : '৭১ চেতনায় অম্লান, (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৯)
চৌধুরী মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা : জিলা পাবনার ইতিহাস, (পাবনা: ১৯৮৬)
জসীমউদ্দিন মণ্ডল : সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিকথা জীবনের রেলগাড়ি (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০২)
জহুরুল ইসলাম বিশু : পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯)
রবিউল ইসলাম রবি : পাবনা ১৯৭১, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০১৬)
রবিউল আলম সেন্টু : স্বাধীনতা যুদ্ধে পাবনার পশ্চিম রণাঙ্গন, (পাবনা: ২০১০)
রেজাউল করিম : ৭১'র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা, (সাঁথিয়া: ২০০৬)
শেখ মুজিবুর রহমান : অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২)
সাঈদ হাসান দারা : মুক্তিযুদ্ধ পাবনা (ঢাকা, গতিধারা, ২০১২)

সহায়ক প্রবন্ধ-স্মৃতিছারণ ও প্রতিবেদন
আক্তারুজ্জামান আক্তার :"আটঘরিয়া যুদ্ধদিবস", আটঘরিয়া '৭১, মো. শফিউল্লাহ সম্পাদিত (আটঘরিয়া: ২০১২)
আব্দুল খালেক বিশ্বাস :"হামিদ ভাই: চরতারাপুর যুদ্ধের এক ভয়াবহ স্মৃতি", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
আবদুল গণি :"একগুচ্ছ নাম: যাঁদের ভুলি নাই ভুলবো না" শতবর্ষ উৎসব স্মারক এডওয়ার্ড কলেজ (পাবনা : ১৯৯৯)
আব্দুদ দাইন :"মুক্তিযুদ্ধে সাঁথিয়া: প্রতিরোধ পর্ব", দৈনিক আজকের কাগজ (ঢাকা: ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩)
:"মুক্তিযুদ্ধে সাঁথিয়া: যুদ্ধ ও বিজয় পর্ব", দৈনিক আজকের কাগজ (ঢাকা: ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৩)
:"২৭ নভেম্বর ধুলাউড়ি হত্যাযজ্ঞ: সাঁথিয়াবাসীর দুঃখ ও বেদনার স্মৃতি", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৭)
:"সাঁথিয়ায় বধ্যভূমি খনন করে ৮ শহীদের দেহাবশেষ উদ্ধার", দৈনিক আজকের কাগজ (ঢাকা: ১২ ডিসেম্বর, ২০০০)
:"চেঙ্গিস খাঁ হালাকু খাঁর নির্মমতাকেও হার মানায়: ডেমরা গণহত্যার ট্র্যাজেডি", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১৪ মে, ২০০৪)
:"কালিয়ানী সম্মুখ যুদ্ধ: সাঁথিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরব ও বেদনার স্মৃতি", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৪)
:আজ ৯ ডিসেম্বর: সাঁথিয়া হানাদার মুক্ত দিবস" (পাবনা: ৯ ডিসেম্বর, ২০০৫)
:"সাঁথিয়ার মুক্তিযোদ্ধা ভানুনেছার করুণ জীবনচিত্র", দৈনিক যায়যায় দিন (ঢাকা: ২১ জুন, ২০০৬)
:"সাঁথিয়ার ডাববাগান যুদ্ধ: একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের এক মাইল ফলক", দৈনিক আজকের কাগজ (ঢাকা: ২০ এপ্রিল, ২০০৭)
আব্দুর রশিদ :"পাবনা জেলায় গণহত্যা", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
আব্দুল জব্বার :"একাত্তরে পাবনার মালিগাছা রণাঙ্গনে রক্ত-ঝরা একটি দিন" পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
আবদুল মতীন খান :"১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাবনা", দৈনিক জোড়বাংলা (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২)
:"মহান মুক্তিযুদ্ধে পাবনার ভূমিকা", দৈনিক নির্ভর (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)
আব্দুস সাত্তার মিয়া :"একাত্তরের বেড়া: ঘটনাপঞ্জি", শব্দের সিঁড়ি, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা (বেড়া: ২০০৪)

আব্দুল হামিদ খান :"১৯৭১ সালের ১লা ডিসেম্বর নাজিরপুর গ্রামে গণহত্যা", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

আমিনুল ইসলাম বাদশা :"একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও পাবনার অভ্যুত্থান", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ২৬ মার্চ, ২০০০)
:"স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে পাবনা : ১৯৪৮-১৯৭১", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯৭)

আলাউদ্দিন আহমেদ :"ঈশ্বরদী", মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯)

আলাউদ্দিন মোল্লা :"প্রসঙ্গ: বাঘাবাড়ি ঘাট ৭ এপ্রিল ১৯৭১", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ২০০০)

আশরাফুল আলম মজনু :"মুক্তিযুদ্ধে সাঁথিয়ার বীর শহীদের পরিচয়", সাঁথিয়ার কণ্ঠ, বিজয় দিবস সংখ্যা, এম আবদুল আলীম সম্পাদিত (সাঁথিয়া: ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪)

এবাদত হোসেন :"একটি অপারেশন: কিছু স্মৃতি", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ২৬ মার্চ, ১৯৯৮)

এম. আবদুল আলীম :"স্বাধিকার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে পাবনা জেলা", ডিজিটাল বাংলাদেশ: দিনবদলের অগ্রযাত্রায় পাবনা, এম. সাইদুল হক চুন্নু সম্পাদিত (পাবনা: জেলা পরিষদ, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)
:পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চর্চা ও সংরক্ষণ", পাবনার ইতিহাস, এম. আবদুল আলীম সম্পাদিত (ঢাকা: গতিধারা, ২০১২)
:"আলোকিত সাঁথিয়া: ইতিহাস-ঐতিহ্যেও পরিলেখ", শেকড়ের টানে, সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনী স্মারক, আশরাফুল আলম মজনু সম্পাদিত (সাঁথিয়া: ২০১২)

এম এ হালিম :"শহীদ শেখ শিহাবুদ্দিন", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)

এস এম মোস্তাকিম :"মনের ডায়েরী থেকে ৭১'র মার্চ", দৈনিক জোড়বাংলা (পাবনা: ৩০ মার্চ, ২০১২)

কাজী সদরুল হক সুধা :"সত্তর-একাত্তরে ঈশ্বরদীর কিছু কথা", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)

কামাল পাশা :"পাকশীতে পাঁচ শহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধের অমর স্মৃতি", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)

খালেকুজ্জামান মিঠু :"মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্ম", স্ফুর্লিঙ্গ (পাকশী: ২০০৯)

গোলাম হাসনায়েন :"মুক্তিসংগ্রামে এম. মনসুর আলী", রক্তাক্ত বাংলা, জেলহত্যা দিবসের বিশেষ প্রকাশনা (পাবনা: শহীদ এম মনসুর আলী স্মৃতি পরিষদ, ১৯৯৮)

জিল্লুর রহমান :"একাত্তরের স্মৃতিচারণ বংশীপাড়া রণাঙ্গন", আটঘরিয়া '৭১, মো. শফিউল্লাহ সম্পাদিত (আটঘরিয়া: ২০১২)

দলিল উদ্দিন দুলাল :"ডাববাগান যুদ্ধ",পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)

নজরুল ইসলাম :"মহান মুক্তিযুদ্ধ ও পাবনা বার", জেলা আইনজীবী সমিতি, ১২০ স্মারক (পাবনা: ২০০০)

ফজলুর রহমান ফান্টু :"ঈশ্বরদীর সাতাশজন মুক্তিযোদ্ধার কোথায় কার কবর", উন্মোচন, ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ বার্ষিকী, স্বপন কুণ্ডু সম্পাদিত (ঈশ্বরদী: তারিখবিহীন)

ফেরদৌস আলম খান গেদামনি :"যমের ঘর থেকে ফিরে আসা", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)

বশীর আহমেদ :"পিয়ারপুরের অ্যামবুশ", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)

বসন্ত দাস :"মুক্তিযুদ্ধে বেড়াবাসীর অবদান ছিল উজ্জ্বলতর", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১ এপ্রিল, ২০০০)

মকবুল হোসেন সন্টু :"১৯৭১ সালের দিনগুলি", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)

মিজানুর রহমান :"সাঁথিয়ার গণকবর, বধ্যভূমি, ভাস্কর্য ও স্মৃতিস্তম্ভ" সাঁথিয়ার কণ্ঠ, বিজয় দিবস সংখ্যা, এম আবদুল আলীম সম্পাদিত (সাঁথিয়া: ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪)

মীর নজমুল বারী নাহিদ :"সাঁথিয়া মুক্তিযুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি", সাঁথিয়ার কণ্ঠ, বিজয় দিবস সংখ্যা, এম আবদুল আলীম সম্পাদিত (সাঁথিয়া: ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪)

মুহঃ আব্দুস সাত্তার বাসু :"পাবনায় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়: বিজয়ের গৌরবগাঁথা", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)

মোঃ আব্দুল জব্বার	:"ফিরে দেখা", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
মোঃ আরিফ ইকবাল টিংকু	:"আমার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল হোসেন আমার আদর্শ", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
মোঃ জহুরুল হক	:"স্মৃতিতে অম্লান চিরদিন ঐতিহাসিক বংশীপাড়া রণক্ষেত্র", আটঘরিয়া '৭১, মো. শফিউল্লাহ সম্পাদিত (আটঘরিয়া: ২০১২)
মোঃ লোকমান হোসেন	:"১৯৭১: অপারেশন সাঁথিয়া হাইস্কুল", সাঁথিয়ার কণ্ঠ, বিজয় দিবস সংখ্যা, এম আবদুল আলীম সম্পাদিত (সাঁথিয়া: ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪)
মোঃ শাহ্ আলম	:"কূটনৈতিক এম হোসেন আলী", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
মোস্তফা সতেজ	:"ডেমরার মৃত্যুঞ্জয়ীরা হতাশ", দৈনিক ইছামতি (পাবনা: ৭ মে, ২০০৮)
মোহাম্মদ আব্দুল করিম	:"মরমী মিল্পী শহীদ এম এ গফুর", বিজয়ের অশ্রু, বিজয় দিবস স্মরণিকা (পাবনা: ২০০৬)
মোহাম্মদ ইসমত	:"আমার মুক্তিযুদ্ধ আমার একাত্তর", ইছামতি, পাবনা দিবস ৮৬তম বার্ষক সাধারণ সভা ও মেলা স্মারক (ঢাকা: ঢাকাস্থ পাবনা সমিতি, ২০১২)
মোহাম্মদ শফিউল্লাহ	:"ঐতিহাসিক পাবনার মুক্তিযুদ্ধ", আটঘরিয়া '৭১, মো. শফিউল্লাহ সম্পাদিত (আটঘরিয়া: ২০১২)
রবিউল ইসলাম রবি	:"শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আল্লা-রাখ্খা খান, দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ২৩ মার্চ, ১৯৯৯)
	:"স্বাধীনতা সংগ্রামে পাবনা", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)
	:"স্বাধীনতা যুদ্ধ: পাবনার গণহত্যা" দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ২৬ মার্চ, ২০০০)
	:"মুক্তিযুদ্ধ পাবনা", দৈনিক জোড়বাংলা (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২)
রণেশ মৈত্র	:"মুক্তিযুদ্ধে পাবনা জেলা", স্মৃতি অম্লান, (পাবনা: বিজয় দিবস স্মারক, ১৯৯৬)
রফিকুল ইসলাম বকুল	:"পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ: এক সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধার স্রষ্টা", শতবর্ষ উৎসব স্মারক, এডওয়ার্ড কলেজ, (পাবনা: ১৯৯৯)
রশিদ হায়দার	:"মুখবন্ধ", জনযুদ্ধের দিনগুলি, আবুল হোসেন খোকন, (ঢাকা: জাগৃতি, ২০১২)
রাজেন চক্রবর্তী	:"কুচিয়ামোড়ার তিন মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের ইতিহাস", দৈনিক নির্ভর (পাবনা : ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৭)
লিয়াকত আলী মঞ্জু	:"শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সেলিম", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
শ ই দুলাল	:"মুক্তিযুদ্ধে একই পরিবারের তিন শহীদ", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)
শফি আহমেদ	:"রক্ত পলাশের ভীড়ে", দৈনিক সংবাদ (ঢাকা: ২২ এপ্রিল, ১৯৭২)
শফিকুল ইসলাম রিপন	:"সাঁথিয়ার দুটি সম্মুখ যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা", সাঁথিয়ার কণ্ঠ, বিজয় দিবস সংখ্যা, এম আবদুল আলীম সম্পাদিত (সাঁথিয়া: ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪)
শফিকুল ইসলাম শিবলী	:"শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস : পাবনার উজ্জ্বলতম মুখাবয়ব", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ২০০০)
	:"পাবনা মুক্ত দিবস: আত্মসমর্পণ দলিলের কড়চা", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১৮ ডিসেম্বর, ২০০২)
	:"শহিদ মওলানা কসিমুদ্দিন আহম্মদ স্মরণে-মননে এক আলোকবর্তিকা", পদ্মা-যমুনা, শামসুল আলম (সম্পাদিত), (ঢাকা: পাবনা সমিতি, ২০১২)
শহিদুল হক মানিক	:"মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)
শামসুজ্জোহা	:"মাধপুর রণাঙ্গন ও শহীদ রাজু", স্ফুর্লিঙ্গ (পাকশী: ২০০৬)
শামসুল আলম	:"মুক্তিযুদ্ধে পাবনা জেলা", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
শাহ নেওয়াজ খান স্বপন	:"শহীদ গোলাম সারোয়ার খান সাধন ও প্রাসঙ্গিক কথা", শতবর্ষ উৎসব স্মারক, এডওয়ার্ড কলেজ, (পাবনা: ১৯৯৯)
	:"বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাবনা ছাত্রলীগের কিছু স্মৃতিকথা", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
শাহ নেওয়াজ খান হুমায়ুন	:"আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি", পদ্মা-যমুনা, শামসুল আলম (সম্পাদিত), (ঢাকা: পাবনা সমিতি, ২০১২)
শেখ মোবারক হোসেন	:"আটঘরিয়া রণাঙ্গন '৭১", আটঘরিয়া '৭১, মো. শফিউল্লাহ সম্পাদিত (আটঘরিয়া: ২০১২)

সাইফুল ইসলাম :"চলনবিলের এক কৃতী সন্তান সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ইয়ার মোহাম্মদ", দৈনিক নির্ভর (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

সুস্মিতা হক মিতা :"শহীদ গোলাম সারোয়ার খান সাধন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ", পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, বশীর আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)

হাবিবুর রহমান স্বপন :"ডেমড়ার স্মৃতিবহ গণহত্যার খোঁজ ৩৯ বছরে কেউ নেয়নি", দৈনিক সংবাদ (ঢাকা: ১২ জানুয়ারি, ২০১০)

:"আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধ", সাঁথিয়ার কণ্ঠ, বিজয় দিবস সংখ্যা, এম আবদুল আলীম সম্পাদিত (সাঁথিয়া: ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪)

সহায়ক পত্র-পত্রিকা ও স্মরণিকা

দৈনিক নির্ভর, বিশেষ ক্রোড়পত্র, মহান বিজয় দিবস, আব্দুল মতীন খান সম্পাদিত (পাবনা: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭)
পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, (ঢাকা: পাবনা মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম, ২০১০)
স্মৃতি অম্লান, (পাবনা: বিজয় দিবস স্মারক, ১৯৯৬)
'রক্তে এলো স্বাধীনতা', এডওয়ার্ড কলেজ, ১৯৭২
'নিবেদন', বিজয় দিবস সংখ্যা, ঈশ্বরদী ১৯৮৬
'স্মৃতি অনির্বাণ', ঈশ্বরদী, ১৯৯৪
বিজয় দিবস স্মরণিকা, পাবনা, ১৯৯৭
'সমস্বর', বিজয় দিবস সংখ্যা, ঈশ্বরদী, ২০০২
'স্মরণিকা, বিজয় দিবস উৎসব, পাবনা, ২০০৩
স্মরণিকা, বিজয় দিবস, ২০০৪
'বিজয়ের অশ্রু', মহান বিজয় দিবস স্মরণিকা, পাবনা, ২০০৬
'বিজয়ের চেতনা', স্মরণিকা, পাবনা, ২০০৭
'ঈশ্বরদীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যালবাম', ঈশ্বরদী, ২০০৮
'হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধ', ঈশ্বরদী, ২০০৯
'পাবনা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী স্মরণিকা', ঢাকা ২০১০
রণাঙ্গন মালিগাছা', মালিগাছা, ২০১০
'আটঘরিয়া ৭১', আটঘরিয়া, ২০১২